দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১৮ সংখ্যা ❖ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

শ্রদ্ধাঞ্জলী
● বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে হরিদাস মিত্র ৩

শিক্ষা
● শিক্ষা সংকট সিদ্ধার্থ সেন ৬

ইতিহাস
● জয় হিন্দ শুভ বসু ৯
● কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ ও মহাত্মা গান্ধি শান্তনু দত্ত চৌধুরী ১১

দেশের খবর
● অসমে ভোটের ঢাকে কাঠি কমলেশ গুপ্ত ১৩
● অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র জন অসন্তোষ অমিতাভ সিংহ ১৫
● নির্বাচন কমিশন ও এসআইআর মজিবুর রহমান ১৬
● জিম নওয়াজের এস.আই.আর শুনানি বয়কট ১৮
● সোমনাথ মন্দিরে নেহরুকে নিয়ে মোদীর অপপ্রচার ও ঐতিহাসিক সত্য শুভাশিস মজুমদার ১৯

আন্তর্জাতিক
● ট্রাম্পের 'ডিসকম্বোবুলেটর' রহস্য সুকুমার মিত্র ২০
● বাংলাদেশে পুতুল শাসন উৎখাতের আহ্বান সুকুমার মিত্র ২১
● গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জামায়েত ই ইসলামীর বক্তব্য ২৩

পরিবেশ
● জলাভূমি ধ্বংস: এক অশনি সংকেত বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় রাহুল রায় ২৪

স্মরণ
● মার্ক টুলি (১৯৩৫–২০২৬) ২৬

ধারাবাহিক
● জরুরি অবস্থা ও সি.পি.আই সুশান্ত দাশগুপ্ত ২৬

আপনজনের কথা
● কটুকাকা'র কথা আজও মনে পড়ে চন্দ্রপ্রকাশ সরকার ২৭

বিশেষ ক্রোড়পত্র
● বন্ধুতার পাতা সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক
শান্তনু দত্ত চৌধুরী
সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।
সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

মহাত্মা গান্ধির হত্যাকারীদের ছিল সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি যে কাপুরুষ হত্যাকারী প্রেম ও অহিংসার পূজারি মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করেছিল সে জানতো এই বৃদ্ধ মানুষটি কখনো নিরাপত্তা রক্ষী নিয়ে চলেন না। মহাত্মা মনে করতেন নিরাপত্তারক্ষী নেওয়ার অর্থ হিংসার সহায়তা গ্রহণ করা। তিনি বলেছিলেন , যদি আমি হিংসার সাহায্য নিয়ে চলি তাহলে People will call me দুরাত্মা । এমনই ছিল তাঁর কঠোর মূল্যবোধ। আর এর সুযোগ নিয়ে বিনা বাধায় হত্যাকারী নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করে।

মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন ' ধূর্ত বিদেশী শাসকরা তাদের স্বার্থের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে তো জাগিয়ে রাখবেই , কিন্তু আমরা, দেশের হিন্দু , মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক, কেনো নিজেদের অবিবেচনার জন্য ও ধর্মান্ধতার জন্য এই ভেদবুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখবো ? কেনো আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য চেষ্টা করবো না ? কেনো আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অগ্রসর হব না , এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের দিকে প্রীতির হস্ত প্রসারিত করবোনা ?

১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর নোয়াখালীতে ভয়াবহ দাঙ্গার খবর পেয়েই গান্ধিজি ৪ নভেম্বর নোয়াখালী পৌঁছন। তিনি চার মাস নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা করে বিপন্ন হিন্দুদের মনে সাহস দেন ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি করেন। ৪৭ এর মার্চের প্রথমে তিনি বিহারে আসেন ও আক্রান্ত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান।আগষ্ট এর দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় আসেন। তাঁর উপস্থিতিতে কলকাতায় ৪৬ এর তিক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলনা। ৪৭ এর সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে ফিরে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অনশনে বসলেন ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। তাঁর ৪৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে পদযাত্রায় যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টার ছিল তীব্র বিরোধী। কার্যত এই সাম্প্রদায়িক শক্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় এজেন্ট। স্বাধীনতার আগে ও পরে এই শক্তি মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে চরম বিভেদমূলক ও হিংস্র প্রচার চালায়। এরাই ছিল নাথুরামের প্রধান উৎসাহদাতা ।

এই হত্যাকান্ড কোনো উন্মাদের কান্ড বলে মনে করার কোনো কারণ ছিল না। অথচ বহু বছর ধরে তাই করা হয়েছে। নাথুরাম গডসে কোনও বিচ্ছিন্ন পাগল ছিলো না। সে ছিল হিন্দুত্ত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির মতাদর্শে দীক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী। মহাত্মার হত্যাকান্ড কে অতীতের ঘটনা বলে আজ আর এড়িয়ে যাওয়া হবে আর এক মারাত্মক ভুল। যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ - এর রাজনীতি মহাত্মাকে হত্যার ব্যবস্থা করেছিল আজ তা সমাজের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় এই ভয়ঙ্কর রাজনীতি আজ রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এখন দেশে সংখ্যালঘু নাগরিককে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। আর.এস.এস -- এর দ্বিতীয় সরসঙ্ঘ চালক এম.এস. গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ' এই দেশে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের হয় হিন্দুদের (পড়ুন সঙ্ঘ পরিবারের) নির্দেশ মেনে চলতে হবে , নতুবা তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকতে হবে। এমনকি তাঁদের ভোটাধিকার পর্যন্ত থাকবে না। ' সেই ব্যবস্থাই এখন করা হচ্ছে। দলিত , প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ, মহিলা ও আদিবাসীরাও এই সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের লক্ষ্য।

দেশের বর্তমানে যা অবস্থা, ঠিক এইরকম অবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম শুরু করেন। অবশেষে সেই সংগ্রাম তিনি ভারতের মাটিতে এসে শুরু করেন ও কোটি কোটি মানুষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমবেত করেন। তাঁর মত ও দর্শনের ভিত্তি ছিল অহিংসা, সত্যাগ্রহ, স্বাবলম্বন , অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ , হরিজন সেবা ও নৈতালিম । গান্ধিজির হত্যাকারীরা আজ তাঁর মতাদর্শকে হত্যা করার জন্য প্রতি মুহূর্তে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে বলা হয়েছে। দেশের গান্ধিজির আদর্শে গড়ে ওঠা আশ্রমগুলি হয় দখল করা হয়েছে নয়তো বুলডোজার দিয়ে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।বিভিন্ন প্রকল্প থেকে তাঁর নাম বদলে দেওয়া চলছে। মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেও এই ঘাতকের মতাদর্শের লোকেদের আতঙ্ক যায়নি । তাই তারা এখনও নানা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃত দেশপ্রেমিক শক্তিকে এর বিরুদ্ধে এক জোট হতে হবে। তাহলেই দেশকে রক্ষা করা যাবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে

হরিদাস মিত্র

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর সঠিক কোন বিবরণই সেদিন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায় নি। আজাদ হিন্দের গুপ্ত বিভাগে সক্রিয় থাকার অপরাধে কলকাতার ক্যামাক স্ট্রীটের এক সরকারী ভবনে মিলিটারি পরিবেষ্টিত গোপন বিচার-কক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিতে দিয়েই আমাদের মৃত্যুদন্ড হয় ১৯৪৫ সালের জুন মাসের এক তপ্ত মধ্যাহ্নে।

কয়েকদিন পরে ৭ই সেপ্টেম্বর। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্ঠের অন্তরালে ফাঁসীর ঘরের মধ্যে পায়চারী করছি। ফাঁসির আসামী আমি। সরকারী লাল রঙের চিঠির লিখনে মৃত্যু পরোয়ানা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জীবনের মেয়াদ আর মাত্র আট দিন। সহসা অনেকগুলো সিপাই-এর সবুট পদধ্বনির কর্কশ শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। স্মিতহাস্যে শান্ত ধীর পদে বর্তমানে পরলোকগতা আমার স্ত্রী শ্রীমতি বেলা জেল সিপাই ও আই বি অফিসার-যুথ পরিবেষ্টিতা, এসে দাঁড়ালেন আমার কারাকক্ষের লৌহকপাটের অদূরে, আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে। দু-একটি সাধারণ কথার পর প্রণাম করবার জন্য হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে বেলা অতি সঙ্গোপনে বলে, 'শেষ চেষ্টা, আজই বাপুজীর কাছে যাচ্ছি পুণাতে'। তার চোখে মুখে স্থির বিশ্বাস ও কঠিন সংকল্পের আভাস লক্ষ্য করি। কিন্তু সংশয়ে আমার মন দুলে ওঠে। আমি মনে মনে ভাবি অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ মহাত্মাজী কেমন করে বিবেচনা করবেন তাদের কথা যারা তাঁর অহিংসার আদর্শকে দেশের মুক্তি-পথ বলে গ্রহণ করেনি, যারা বিরাট সহিংস বৈপ্লবিক সংগ্রামে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল, যারা সশস্ত্রে সসৈন্যে আসাম বর্মার সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল।

তবুও দেখি এর সাত দিনের মধ্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর পুণার নেচার কিওর ক্লিনিক থেকে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে চিঠি লিখলেন গান্ধীজি, 'প্রিয় বন্ধু ! লন্ডন থেকে ফিরে আসা মাত্র এই চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সম্পূর্ণ মানবতার তাগিদেই এই চিঠি লিখছি। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর মাত্র ২২ বৎসর বয়স্কা তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি বেলার স্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ. শ্রীহরিদাস মিত্র মনে হয় অযৌক্তিক কারণে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত হয়েছেন.....সে যাই হোক না কেন, জাপানের সহিত যুদ্ধ-শেষে দয়া প্রদর্শনই একান্ত বিধেয়।' (মূল ইংরাজিঃ "Dear friend– I am sorry that I have to worry you almost immediately on your return from London. My only excuse is that my mission is purely humanitarian. Shri Haridas Mitra– an M.A. of the Calcutta University and the husband of Shri Subhas Chandra Boseós young niece Bela– aged 22 years– is under sentence of death over what appears to be an untenable ground. In any event the case for merey becomes irresistible in that the war with Japan is over"– Page 46. Gandhijiós Correspondence with the Government. Published by Navajivan Publishing House. Ahmedabad.) লিখলেন তিনি এই বন্দীদের ঘটনা সম্পর্কে বন্দীর স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; এই মেয়েটিই আমি শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে থাকা কালে সেবা যত্নে এবং ভজন গানে আমাকে তৃপ্ত করেছে। এ পত্রের শেষ পর্যায়ে মহাত্মাজী লিখলেন, 'যদি এই মৃত্যুদন্ড কার্যে পরিণত করা হয়, তাহলে এটা হবে চরমতম রাজনৈতিক ভ্রান্তিদ (মূল ইংরাজি-'It will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect"-- Page 47 of the above book).

এর দুদিন পরে যখন মৃত্যুদন্ড কার্যে পরিণত করবার সামান্যক্ষণ বাকি, ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত, তখন আলিপুর জেলে সংবাদ এলো আমাদের মৃত্যুদন্ড সাময়িকভাবে স্থগিত রইলো বড়লাটের আদেশে। এরও পঁচিশ দিন পরে আমাদের সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ যখন গান্ধীজির কাছে পৌঁছল না, তখন পুনরায় বড়লাটকে তিনি লিখলেন, 'এই মৃত্যুদন্ড মকুব করা হবে এই প্রত্যাশায় বন্দীদের সপক্ষে সমস্ত গণবিক্ষোভ আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। বন্দীর তরুণী পত্নী উদ্বিগ্ন হয়ে বলছে, এই ব্যাপারে দেশে ও গ্রেট ব্রিটেনে অচিরে গণআন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও সে আমার কথা শুনেছে এবং ধৈর্য ধরে প্রতিক্ষা করছেক্ষ্ম (মূল ইংরাজি- "I have preventedp all public appeals and demonstrations in favour of the prisoner in the hope that the death sentence will be commuted. His young wife was anxious that a move should be made publicly here and also in Great Britain. But she listened to me and has waited"– Page 48 of the above book).

এদিকে আমরাও ফাঁসির ঘরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি। প্রতি পঁচিশ দিন অন্তর একবার করে ফাঁসির মঞ্চ সাজান হয়, আমাদের ওজন নিয়ে ফাঁসির রজ্জুকে পরখ করে দেখা হয় এবং শেষ দিনের সংকেত আমাদের জানান হয়। ওদিকে এই চিঠিরও সময় মত উত্তর আসছে না; বাপুজী অস্থির হয়ে উঠছেন। তবুও বেলাকে সান্ত্বনা দিয়ে

বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, তোমাকে শিগগিরই সুখবর জানাবো, তোমার মুখে হাসি ফোটাবো, আনন্দে তোমার ভজন গান শুনবো, তারপর তোমার ছুটি দেবো।ক্ষ্ম এর পরও দশ দিন কেটে যায় কোনও খবর আসে না। তখন গান্ধীজি পুনরায় বড়লাটকে লিখলেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত সকল বন্দীরা যে কোনও কারণেই হোক যুদ্ধ শেষ হবার পরও জীবিত আছে। এটা কি অত্যন্ত বেশী হবে যদি এই ধরণের সমস্ত বন্দীদের মৃত্যুদন্ড মকুব করবার জন্য আপনার কাছে পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করি?' এই পত্রের শেষ লাইনে তিনি লিখলেন, 'আমার মতে, বিচারকে যদি ন্যায়-বিচারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তার সুসমঞ্জস বিধানের জন্য দয়া প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে।ক্ষ্ম (মূল ইংরাজি- " In my opinion– Justice– to be real justice– requires extension of mercy to temper it–Page 49 of the above book). এই চিঠির বার দিন পরে ১৯৪৫-এর ১লা নভেম্বর আমাদের চার মাস পাঁচ দিন ফাঁসির ঘরে থাকার পর নূতন দিল্লির ভাইসরয় ভবন থেকে মহাত্মাজীকে জানান হোল আমাদের সকলের মৃত্যুদন্ড রহিত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ বড়লাট লর্ড ওয়াভেল জারি করেছেন।

গান্ধীজি কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হলেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক সম্বন্ধে দয়া প্রদর্শনের নিদর্শন হিসাবে নূতন করে আর মামলা দায়ের করা হবে না, ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মাজি আমাদের কারামুক্তির দাবি করে বড়লাটের কাছে চিঠির পর চিঠি লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই সেই সম্বন্ধে বড়লাটকে শেষ চিঠি লিখলেন, 'প্রিয় বন্ধু, চারটি বিনিদ্র রজনীর গভীর চিন্তার পর, এটি আপনাকে জানা আমার কর্তব্য মনে করি যে, শ্রীহরিদাস মিত্রের মুক্তিদানে কালক্ষয় করে আপনি অন্যায় করছেন, এটি সরকারি ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন'। (মূল ইংরাজি-" Dear friend– having slept over it for four nights– I feel it to be my duty to say that it seems your Excellency is wrong to delay the release of Shri Haridas Mitra. It is inconsistent with the declared policy of the Government" Page 55 of the same book). ?

দিন গড়িয়ে চলে, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভাঙাগড়ার কাজ শুরু হয়। পন্ডিত নেহেরু ও প্যাটেলের নেতৃত্বে হয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিষ্ঠা। তখনও আমরা কারান্তরালে যাবজ্জীবন দন্ডভোগ করছি। গান্ধীজির ইঙ্গিতে শ্রীমতি বেলা দিল্লিতে আবার ছুটে যান। দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রাক্কালে ভাঙ্গী কলোনিতে বাপুজীর পাশে বসে বেলা আমাদের সকল বন্দীদের মুক্তির দাবি পন্ডিত নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের কাছে উপস্থিত করেন। মহাত্মাজী পূর্বেই বেলাকে বলেছিলেন, 'অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব নেহেরু-প্যাটেলের উপর এসেছে। তাই এই বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আমার ইচ্ছা সরাসরি তাঁদের উপর চাপাতে চাই না; তুমি শুধু আমার পাশে বসে এই বন্দীদের কথা নেতাদের সামনে তুলে ধরবে।' এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মুক্তির আদেশ দেন; কিন্তু বাংলা দেশে সুরাবরদি সরকার নানা টালবাহানার পর আরও দু-মাস আমাদের জেলে আটকে রেখে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকিতে আমাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

এই ছিলেন গান্ধীজি। প্রতিজ্ঞায় কঠোর, স্নেহে কোমল, কর্তব্যে অটল। বিপন্ন মানুষের আবেদনে, মত ও পথের পার্থক্য তাঁকে টলাতে পারেনি। সত্যসন্দ মহাপুরুষ। বিবেকের ঐশী নির্দেশে যাকে সত্য বলে মনে করেছেন সেখানে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ তো ছার, পৃথিবীর কোনও শক্তিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

মুক্তি পেয়েই সর্বপ্রথম নোয়াখালিতে আর্তসেবারত মহাত্মাজীকে আমাদের মুক্তির খবর জানালাম, শ্রীমতি বেলার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদও এতে ছিল। উত্তরে গান্ধীজি বেলাকে চিঠি লিখলেন। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখা চিঠি কয়টির এটি অন্যতম। তিনি লিখলেন, 'পরম স্নেহের বেলা, হরিদাস ফিরে এসেছেন, কত আশা, কত উদ্বেগ নিয়ে, তোমার কি এখন শুয়ে থাকলে চলে? তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র সুস্থ হয়ে স্বামীর কাজে সহায় হও, তারও অন্তরে বল দাও। ইতি। বাপুর আশীর্বাদ।'

এমনি অন্তরের ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিলেন তিনি।

(দুই)

১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সকালের টেনে এসে নামলাম নোয়াখালি জেলার সোনাইমারি রেল স্টেশনে। এখানে শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশ দাশগুপ্তের কাজিরখিল ক্যাম্পের একজন স্বেচ্ছাসেবক একটি জীপগাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম, আমাদের আসবার টেলিগ্রাম পেয়ে, আমার সঙ্গী শ্রীমতি বেলার অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে, গান্ধীজি নিজে পূর্বদিন শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই জীপের ব্যবস্থা করেছেন। মহাত্মাজি তখন সোনাইমারি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নোয়াখালির সুদূর পল্লী অঞ্চল নন্দীগ্রাম ক্যাম্পে আছেন। এই ত্রিশ মাইল পথ জীপে একটানা যেতে অসুস্থ বেলার অসুবিধা হবে ভেবে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা স্টেশন থেকে দশ এগার মাইল দূরে কাজিরখিল ক্যাম্পে

নেমে, স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, পরে যেনো নন্দীগ্রামে যাই। বাপুর নির্দেশমত কাজিরখিল ক্যাম্প হয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় নন্দীগ্রাম গান্ধী ক্যাম্পে পৌঁছালাম। বাপু তখন প্রার্থনা সভায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। আমাদের দেখামাত্র ত্রস্তপদে উঠে এসে আমার স্ত্রী শ্রীমতি বেলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেলা, তুমি এসে গেছ, তোমার জন্য একটু চিন্তিত ছিলাম।' তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টিমারে, রেলে, জীপে আমাদের কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা, কাজিরখিল ক্যাম্পে গিয়ে স্নানাহার করেছিলাম কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন পরম আত্মীয় অভিভাবকের মত একের পর এক করে যেতে লাগলেন। সত্যি কথা বলতে কি. তাঁর এই স্নেহস্পর্শে অসুস্থ বেলার এই দুদিনের পথশ্রম এক নিমেষে যেন লাঘব হয়ে গেল। প্রশ্নাদি শেষ করে তিনি বললেন, 'আর এখানে নয়, চল প্রার্থনা সভায় যাওয়া যাক।' কুটিরের অদুরেই প্রার্থনা সভা। যথারীতি রামধুন সঙ্গীত হয়ে যাবার পর, বাপুজীর ইচ্ছায় বেলা সবাইকে ভজন ও কীর্তন গেয়ে শোনালেন।

জানুয়ারী মাসের শীতের রাত কোথায় কাটান যায়, খাওয়া দাওয়ারই বা কি হবে, এই নিয়ে পরিচিত সাংবাদিক ও অন্য দু-একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেই সময় মহাত্মাজীর সেক্রেটারি শ্রদ্ধেয় নির্মল বসু মশাই এসে বাপুজীর কাছে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাপু বললেন, 'তোমরা যে কদিন এখানে থাকবে, আমার এখানেই খাবে।' খাবার পর শ্রদ্ধেয় নির্মলবাবু বললেন, গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি আমাদের শোবার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু শুতে যাবার আগেই আবার বাপুজীর ডাক পড়লো। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করে আমাকে বললেন, 'বেলা আমার প্রিয় নাতনী, তুমি আমার নাতজামাই, কিন্তু সে আদর তো তোমাকে করতে পারছি না। তবে এখানেই তোমাদের শোবার ব্যবস্থা করেছি, অন্ততঃ জেলের চাইতে তো খারাপ কিছু হবে না; আর তাছাড়া বেলাও তো থাকবে সঙ্গে।'লজ্জায় সঙ্কোচে, শ্রদ্ধায় আনত হলাম। দেখলাম তাঁর কুটিরের এক অংশে আমাদের জন্য বিছানা করা আছে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

নোয়াখালির সেই শ্মশানের উপর দাঁড়িয়ে শুধু আতঙ্ক, অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এই মহামানবের সবদিকের সকল ব্যবস্থার উপর কি সজাগ দৃষ্টি। কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য আমরা। কিন্তু যে কদিন তাঁর সঙ্গে ছিলাম স্নেহে, করুণায়, মমত্বে তিনি আমাদের নিরন্তর অভিসঞ্চিত করেছেন। দুঃখ করে বলতেন, 'এখানে তোমাদের খাওয়া থাকার কত অসুবিধা হচ্ছে, নানা গোলমালে কিছুই ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।'

শীতের রাতে তখনও শেষ হয়নি, আকাশ তারায় ভরা; বাপুজীর কুটিরের মধ্যেই প্রার্থনা সভায় বসলাম। নিয়মিত এক অধ্যায় গীতা পাঠ হোল, কোরাণ আবৃত্তি হোল। বেলা একটা ভজন গান গাইলেন। প্রার্থনা শেষে বাপু বললেন, তএখনও সকাল হতে দেরি আছে, তোমরা শুয়ে পড়ো, সারা দিন বড় শ্রান্ত হয়েছো।দ আমরা শুতে গেলাম। যাবার সময় দেখলাম তিনি লণ্ঠন জ্বালিয়ে একলা বসে লিখতে লাগলেন।

ভোর হতে না হতেই মহাত্মাজীর ঐতিহাসিক পদযাত্রার আয়োজন শুরু হোল। সেদিনের সংবাদপত্র এই যাত্রাকে 'স্বরণীয় পরিক্রমা' বলে অভিহিত করেছিল। তাঁর সহযাত্রী হতে পারায় সেদিন নিজেকে কৃতার্থ বোধ করেছিলাম। ঘন সুপুরি নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে তরুবীথিকা সমাচ্ছন্ন সরু পায়ে চলা পথে, রামধুন গাইতে গাইতে দলটি এগিয়ে চলেছে; সবার আগে চলেছেন, বেলা ও মানু গান্ধী। এই দুজনের দুকাঁধে হাত রেখে সেই মহামানব। গ্রামের মেঠো পথে জানুয়ারী মাসের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায়, যথেষ্ট গরম পোশাক পরেও যখন আমরা শীত বোধ করছি, অবাক হয়ে দেখলাম কটিবাস পরিহিত সেই তাপস, সামান্য একখানি খদ্দর-চাদর গায়ে জড়িয়ে শিশির ভেজা পথে প্রায় নগ্নপদে নির্বিকার চিত্তে চলেছেন। দুপাশের পোড়াবাড়ী থেকে পল্লী মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে আসছিলেন। বাপুজী প্রশান্ত হাস্যে তাদেরই দেওয়া গাঁদা ফুলের মালা তাদেরই গলায় পরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। সেই রিক্ত লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষের দল অশ্রুসিক্ত নয়নে এই মহামানবের পদধূলি নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। দূর দূর থেকে কাউকে ছুটে আসতে দেখলেই, তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন। প্রতিটি মানুষের দুঃখ বেদনা নিজের হাতে মুছে দিতে চেয়েছেন।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা প্রসাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে একরাত্রি আমরা ছিলাম। হঠাৎ গভীর রাত্রি প্রায় তিনটার সময় একবার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বাপু আলো জ্বালিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করছেন। বুঝলাম, ক্লিষ্ট মানুষের একান্ত সেবায় সারা দিন ব্যাপৃত থেকেও, তাঁর বেদনার্ত অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে। বিনিদ্র রজনী তাই তিনি সকলের অগোচরে নিঃশব্দে যাপন করেন।

এবার বিদায়ের পালা। বাপুজীর কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনারই একান্ত প্রচেষ্টায় ফাঁসির ঘরে গিয়েও যে জীবন ফিরে পেয়েছি, তা যদি আপনার কোনও কাজে লাগে, নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবো। 'একটু মৌন থেকে উত্তর দিলেন, 'মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জীবনকে তুচ্ছ করে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, তাতে আত্মত্যাগের সঙ্গে উন্মাদনাও ছিল। কিন্তু আমার পথ সম্পূর্ণ পৃথক, কর্মপদ্ধতিও

আলাদা; তাতে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট আদর্শগুলিকে রূপায়িত করতে হবে, সে কাজে চাই ধৈর্য, চাই সহনশীলতা বহুদিনের শিক্ষায় তা আয়ত্ত করা যায়; তাই এই মুহূর্তে আমার কাজে তো তোমাকে নিতে পারছি না। তবে বেলা সুস্থ হয়ে উঠলে আমার প্রয়োজনে ওকে আমি ডাকবো।' একটু মৃদু হেসে আবার বললেন, 'তখন যেন আটকাতে চেয়ো না।'

বেলার দুচোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বাপুজীর পদধূলি মাথায় নিয়ে আমরা দুজনে ধীরে ধীরে কুটির থেকে বেরিয়ে এলাম।

(লেখক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের হয়ে গোপনে তাঁরা তথ্য পাঠাচ্ছেন এই অভিযোগে তিনি ও আরও চারজন গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁদের মুক্ত করেন। সেই কাহিনী লিখেছেন হরিদাস মিত্র। আমরা তাঁর লেখাটি পুনঃ প্রকাশ করলাম।)

শিক্ষা

শিক্ষা সংকট

সিদ্ধার্থ সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

দুশো বছর পর দেশ স্বাধীনতা পেল ১৯৪৭ সালে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র, সমস্ত কিছুতেই দেশের অবস্থান শোচনীয়। দেশের সাক্ষরতার হার তখন ১২%। জনসংখ্যার প্রায় ৮০% লোক দারিদ্র সীমার নিচে। সেই সাথে দেশভাগের ক্ষত। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগন্য। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হাতে গোনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলতঃ সরকারি আনুকূল্যে চলত। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, যেমন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বাঙ্গালোর, ইত্যাদি। এরই মধ্যে সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিল। প্রথমটি দেশের কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা সমাগত জেনে কংগ্রেসের তরফ থেকে নলিনী রঞ্জন সরকার কমিটি গঠন করা হল, উদ্দেশ্য স্বাধীনোত্তর ভারতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের একটি রূপরেখা তৈরি করা। সর্বভারতীয় এই কমিটি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিলো; তাতে প্রস্তাব করা হলো, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশের কয়েকটি স্থানে তৈরি করা হোক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বা আই.আই.টি.। অচিরেই ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি রাখার জন্য তৈরি হিজলি কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রতিষ্ঠিত হল খড়্গপুর আই. আই. টি। পরবর্তী এক দশকে আরও চারটি আই.আই. টি. বম্বে, মাদ্রাজ, কানপুর ও দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হলো যথাক্রমে রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সহযোগিতায়। আজকের দিনে ফিরে তাকাতে গেলে সেটি ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসবো।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো দেশে প্ল্যানিং কমিশন গঠন। তার নেতৃত্বে বসানো হলো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশকে। সীমিত আর্থিক পরিসরের মধ্যেই তারা জোর দিল, গ্রামে গঞ্জে শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল খোলা, সেই সাথে নতুন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা। সমস্তই চলতো সরকারি আনুকূল্যে। সেইসাথে বিভিন্ন রাজ্যে কারিগরি শিক্ষায়তন, মেডিকেল কলেজ ও কেন্দ্রীয় স্তরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আই.আই.এম.) প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিষ্ঠিত হয় CSIR এর মতো বহু বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। প্রথম ত্রিশ বছর স্কুল কলেজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সময় উন্নত বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক পাঠ্যসূচী তৈরি করা হয় এবং যুক্তি দিয়ে, প্রমান দিয়ে বিচার করার রীতিটাই পালন করার চেষ্টা করা হয়। সেই সাথে বহু গরিব ঘরের যোগ্য ছেলেমেয়েরা নামমাত্র খরচায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পায় এবং পেশাদার জীবনে স্বীকৃতি লাভ করে।

নানা সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্যেও একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে স্বাধীনতার পরে প্রথম ত্রিশ বছর যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই নতুন উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। সেখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যেন বসু বা সি ভি রমনের মতো নক্ষত্রের উদয় হয় নি ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার প্রসার হয়েছে অনেকখানি। এর ফল প্রত্যক্ষ করা গেল পরবর্তী ত্রিশ বছরে। মহাকাশ গবেষণা ও পারমানবিক গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখায় ইসরো এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা। দেশ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা নিয়ে যারা বিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাকেন্দ্রে কাজ করতে গিয়েছেন, অচিরেই তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর অন্যতম উদাহরণ, বিশ্বের সফটওয়্যার শিল্পে। কম্পিউটার বা তার সহযোগী ক্ষেত্রে কোনো

যুগান্তকারী আবিষ্কার ভারতীয়রা কেউ হয়তো করে নি। কিন্তু আজকের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার শিল্পের শীর্ষপদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠান করছেন ভারতীয়রা। এর পেছনে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার পরে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কেন্দ্রগুলি অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানির মধ্যেই অনেকগুলিই আজকের দিনে সারা বিশ্বের যোগানের একটা বড় অংশ সরবরাহ করছে। কিন্তু সেই তুলনায় দেশের ভারী শিল্পোদ্যাগগুলি কিন্তু বিরাট কিছু উন্নতি করতে পারে নি। তবে তার সম্ভাব্য কারণ এই লেখার পরিসরে আলোচনা করার সুযোগ নেই।

(৪)

দেশের ভারী শিল্পের বিকাশ কম হবার অন্যতম ফলশ্রুতি দেখা গেল চাকুরী ক্ষেত্রে। শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, বছরে বছরে বিরাট সংখ্যার ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য উপযোগী চাকরির সুযোগ নেই। তাই বেকার সমস্যা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। যেকোনো সরকারি চাকরিতে, তা সামান্য সাফাই কর্মী বা পুলিশ কনেস্টবলের চাকরির পোস্ট হোক না কেন, আজ হাজার হাজার বি.এ., এম.এ., পি.এচ. ডি ডিগ্রিধারী প্রার্থী দরখাস্ত করছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে।

এই সাথে আর একটা লক্ষ্মণ ইদানিং প্রকট হয়ে উঠছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য কোনো বিষয়কে discover করা। কিন্তু আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে, সেই discover কে গুরুত্ব না দিয়ে নজর বেশি পরীক্ষার নম্বর বেশি পাওয়ার দিকে, বা IIT /NEET /JEE জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার দিকেই। তার ফলে গজিয়ে উঠছে নানা কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট স্কুল ইত্যাদি। তাদের নজর চটজলদি কিভাবে কম পরিশ্রমে বেশি নম্বর পাওয়া যায়, তার দিকে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা। যে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা তৈরি করা। কি, কেন, কিভাবে - তার উত্তর খোঁজার জন্য তাকে প্রস্তুত করা। কিন্তু সে সব বাদ দিয়ে তোতাকাহিনীর সেই পাখিটির মতো সমস্ত কিছু মুখস্ত করানোই আজকাল চল হয়ে উঠছে। এর পিছনে যেমন সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা আছে, তেমনই আছে অভিভাবকদের অতিরিক্ত সচেতনতা। এই ছাত্রদের অনেকেই হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থী। বাবা মা হয়ত সুযোগ না পেয়ে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পান নি। এখন ভালো করে মানুষ করার জন্য তাঁরা হয়ত মাত্র একটি বা দুটি সন্তান বড় করছেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পিছনে কে বেশি সচেতন সেটা বিচার করার পদ্ধতি হচ্ছে, কে তাদের পেছনে কত বেশি খরচ করছে। কাজেই পাঠাও ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট স্কুলে; তারপরে কোচিং এ, তারপর হয়তো বাড়িতে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। ফলে ছেলেমেয়েদের কাছে খেলাধুলা বা অন্যান্য মানসিক বিকাশের অবকাশ থাকছে না। গল্পের বই বা অন্য কোন বই নিজে নিজে পড়ার অভ্যাসও তৈরি হচ্ছে না। একই বিষয় বারবার পড়তে পড়তে তাকে আবিষ্কার করার আনন্দ তো দূরের কথা, কোনো কিছু কল্পনা করতেই শিখছে না।

এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। তাদের চাই চটজলদি সাফল্য। এর সাথে যে ব্যর্থতাও যে সহজভাবে গ্রহণ করতে হয়, বা শিক্ষা যে একটা ম্যারাথন দৌড়, এই খবরটি কোনোদিন ছাত্রটির কাছে পৌঁছয় নি। নতুন ডিজিটাল সভ্যতায় সেই ছাত্রটি হয়ে উঠছে আরও আত্মকেন্দ্রিক। নগর সভ্যতা ও টিউশনের অতিরিক্ত চাপে তাদের খেলাধুলার পরিবার সীমিত। এর ফলে মাঝে মাঝেই এরা মানসিক বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। মানসিক রোগের চিকিৎসা যদি সময় মত না করা যায় তবে মাঝেমাঝেই তার ফল ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। আজকাল রাজস্থানের কোটায় বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে বা আই.আই.টি গুলিতে ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার প্রবণতায় গোটা সমাজ এখন আশংকিত। কিন্তু এর জন্য দায়ী আমাদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি, প্রকৃত শিক্ষার প্রতি সরকারি অবহেলা, সেই সাথে আমাদের অভিভাবকদের দূরদৃষ্টির অভাব। যদি এই ব্যাপারে আমরা এই মুহূর্তে সচেতন না হই তবে ক্রমশঃ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষক সমাজেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব অনেক।

(৫)

স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হওয়ার পরে দেশে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের উপরে যৌথভাবে বর্তাল । সেই অনুযায়ী স্কুল কলেজে পঠন-পাঠন কি হবে তা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথভাবেই ঠিক করার কথা। এ বাবদ ব্যয়বহনের দায় দুই তরফেরই। স্কুল শিক্ষার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রতিটি রাজ্যের স্কুল শিক্ষা পর্ষদের উপরে। পাশাপাশি রাজ্যগুলিতে কিছু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়, মূলতঃ যে সব ছাত্রছাত্রীর বাবা-মা ভিন রাজ্যে বদলির চাকরি করেন তাদের সুবিধার জন্য। এদের দেখভালের জন্য তৈরী হয় NCERT। তা ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রমের মধ্যে সাযুজ্য রক্ষা করা, শিক্ষণ পদ্ধতির উপরে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বও দেয়া হয় এই সংস্থাকে। এই সব

ব্যাপারে NCERT র ভূমিকা ছিল উপদেষ্টা হিসেবে। সংস্থাটি ছিল স্বশাসিত। কেন্দ্র ও রাজ্যের মনোনীত খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতীদের নিয়েই গঠিত এর কর্মসমিতি। বিগত কয়েক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে এদের উদ্যোগে বহু নামি দিকপালদের জড়ো করে পাঠ্যপুস্তক লেখার নানা কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং এই সংস্থা থেকে তা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হত।

একই রকমভাবে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যলয়ের পাঠ্যসূচির উপরে নজরদারি ও পাঠ্যক্রমের রূপায়ণ ও নতুন কলেজের স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে গঠিত হয় UGC। আবার কারিগরি শিক্ষা বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত হয় আর একটি আলাদা সংস্থা - AICTE। এদের প্রত্যেকটিই ছিল স্বশাসিত সংস্থা। এই দুই সংস্থার উপরে আর একটি বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়ঞ্ছ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার মান উন্নয়নে উৎসাহ জোগানো ও তার দিকনির্দেশিকা প্রস্তুত করা। বিভিন্ন স্তরে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থাকে সাহায্যদানের জন্য অর্থ সাহায্য অনুমোদন করার ক্ষমতাও এদের ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সব কাজকর্মের অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা করার ব্যবস্থাও ছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য- সবার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি এই সাহায্য পেতে পারতো।

স্বাধীন ভারতের প্রথম লগ্নে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজ করছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে, বোম্বাই, দিল্লি, আন্না, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এদের মধ্যে অন্যতম। এদের ভরণ পোষণের দায় এবার পড়ল তাদের রাজ্য সরকারের উপরে। আর কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করলো বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, IIT – AIMS – IIM– ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলো ছিল স্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে এগুলি চালানোর খরচ যোগাত কেন্দ্র। স্বাধীনতার পরে প্রথম কয়েকটি দশক এইভাবেই চলেছে। কেন্দ্র, রাজ্য দুই তরফেই সাধ্যমত নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সাথে পুরোনো নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করেছে। তবে সামগ্রিক ভাবে দেশের সামগ্রিক আয় (GDP) এর নিরিখে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাবরই অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় কম। অনেক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমাদের বাজেটে কোন বছরেই শিক্ষাখাতে ব্যয় কখনোই GDP র তিন থেকে চার শতাংশের বেশি হয় নি।

স্বাধীনতার পরের প্রথম যুগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদে অলংকৃত করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা - মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবির, ত্রিগুণা সেন, ভি কে আর ভি রাও প্রমুখ। প্ল্যানিং কমিশনের শীর্ষে ছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ছিলেন নামিদামি বৈজ্ঞানিক ও গবেষক। তা ছাড়াও ছিল বিজ্ঞান কংগ্রেস, ইতিহাস কংগ্রেস, সাহিত্যে একাডেমি, INSA– NASI, ইত্যাদিদের মতো স্বশাসিত সংস্থা, যাদের কাজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৃজনশীল গবেষণা ও সৃষ্টিকে উৎসাহ দেওয়া। ছিল নানা ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞানক্ষেত্রে CSIR– ICAR– ISRO– BARC ইত্যাদি গবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে হয়। এই সব সংস্থার মাথা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগের পদ্ধতি ছিল মোটামুটি স্বচ্ছ। যদিও দুএকটি ক্ষেত্রে নিজেদের পেটোয়া লোক নিয়োগ হয় নি, তা নয়, তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে এই পদগুলি যারা অলংকৃত করেছেন তারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিলেন এক এক জন দিকপাল। আর এই সব সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ছিল ন্যূনতম।

এই ব্যবস্থার মধ্যে চিড় ধরার লক্ষণ দেখা দিল, যখন রাজ্যগুলি তাদের আর্থিক দৈন্যতার কারণ দেখিয়ে রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ কমাতে শুরু করলো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে শুধুমাত্র তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে সহযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা দেখা গেল। তার ফল স্বরূপ রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্বাবিদ্যালয়গুলিতে আর্থিক দৈন্যতা প্রকাশ পেতে শুরু করল। রাজ্যের উদ্যোগ এগুলিকে কোনোমতে দৈনন্দিন কাজ চালানোর প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকল। তাদের সুস্থ বিকাশ, পরিচালনা ও নজরদারির দিকে নজর ক্রমেই সরে আসতে লাগল। সেই সাথে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উৎকর্ষতার পরিবর্তে শাসক দলের প্রতি আনুগত্যই বড় ভূমিকা নিতে শুরু করলো। গত দশকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ভুরি ভুরি দুর্নীতি আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করেছে। আর এই সবের ফলে তৎকালীন নামি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি - যেগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলত তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের উৎকর্ষতা হারাতে শুরু করল। স্কুল, কলেজগুলিতে ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যা ও তাদের অপর্য্যাপ্ত পরিকাঠামো এর পেছনে বেশ কিছুটা দায়ী।

এর অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা গেলো, অসংখ্য বেসরকারি স্কুল, কলেজের উত্থান। বেসরকারি স্কুলগুলিতে চকচকে বাড়িঘর, ঝকঝকে ইংরেজি বুলি ও বাহারি সাজপোশাক এবং তার পাশাপাশি সরকারি স্কুলের বহিরঙ্গের দৈন্যদশা তুলনা করে অনেক অভিভাবকেরই চোখ ঘুরে গেলো। তাঁরা এই সব স্কুলের শিক্ষার মান বিচার না করেই ছেলেমেয়েদের মুখে দু কলি ইংরেজি ছড়া ও আদব

কায়দা দেখে মোহিত হয়ে দলেদলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের এইসব বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে শুরু করলেন, তাদের মাসমাহিনা যতই আকাশছোঁয়া হোক না কেন। এর পিছনে অবশ্যই সরকারি স্কুলগুলির নতুন ছাত্রদের আকর্ষণ না করতে পারার ব্যর্থতা কাজ করেছে। এর ফলে দেশের স্কুলগুলিতে গড়ে উঠেছে এক ধরনের 'ডিজিটাল ডিভাইড'। যারা অবস্থাপন্ন, তারা নিজেদের বাচ্চাদের ভর্তি করাচ্ছে এই সব ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারি স্কুলে, আর যারা গরিব, তাদের ভরসা ওই সরকারি স্কুল। স্বাধীন ভারতের প্রথম যুগে কিন্তু এই ভেদাভেদ ছিল না। স্কুলগুলির সাথে সাথে দেশে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের বেশিরভাগেরই মানের উৎকর্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে ছাত্রদের মানসিকতার পরিবর্তনের কথা আগেই আলোচনা করেছি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(লেখক আই.আই.টি, খড়্গপুর - এর প্রাক্তন অধ্যাপক)

ইতিহাস

এলেমেলো কথা

জয় হিন্দ

শুভ বসু

হিন্দুস্তান কি হিন্দুদের? আসলে হিন্দুস্তান এবং হিন্দুস্থান দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা। প্রাচীন পাহলিক ভাষায় সিন্ধু কে হিন্দু বলা হতো। পরে আরবরা বলে আল -হিন্দ তার থেকে ধারণা তৈরী হয় হিন্দুস্তানের। দিল্লির সুলতান দের ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মামালিক -ই-হিন্দুস্তান বলে অভিহিত করা হত। মুঘল বাদশাহরা পরিচিত ছিলেন শাহানশাহ ই হিন্দুস্তান বলে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা গালিব লিখেছিলেন

'হিন্দুস্তান সায়াহ -ই গুলি পা-এতখ্ত থা
যাহা-ও-জালাল-ই -আহাদ -এ বিশাল-এ ফুটান নাহ পুছ'

হিন্দুস্তান ছিল সিংহাসনের পাদদেশে গোলাপের ছায়া দেবতাদের সাথে মিলনের সেই যুগের মহিমা, জাঁকজমক, জিজ্ঞাসা করো না।

গালিব সাহেব ভারতের প্রথম আজাদীর যুদ্ধে দিল্লির পতন দেখেছিলেন। তিনি তাই এই কবিতা লিখেছিলেন। দিল্লিতে কাসিম জান সড়কে রয়েছে গালিবের হাভেলি যেখানে কবির স্মরণে সময় থমকে থাকে আর লেখা থাকে

উগ রাহা হয় দার -ও -দিবার সে সবজা গালিব,
হ্যাম বেয়াবান মে হায় অর ঘর মে বাহার আইই. হায়

দরজা আর দেয়াল দিয়ে সবুজের সমারোহ গজিয়ে উঠছে, 'গালিব'!

আমি মরুভূমিতে আছি আর আমার বাড়িতে বসন্ত এসে গেছে।'

হিন্দুস্তানের শান সৌকত দেওয়ান এ গালিব এর সঙ্গে যুক্ত। আসলে হিন্দুস্তান হলো একটি ধারণা যার ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের ভূগোলের সঙ্গে যুক্ত। একসময় দাক্ষিণাত্য এই চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরে। যদিও বাঙালিরা মনে করতেন রাজমহল পাহাড় পেরিয়ে বিহার থেকে পাঞ্জাবের শেষ পর্যন্ত যে বিশাল সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা রয়েছে তা হল হিন্দুস্তান। সেই কারণের শরৎ চন্দ্রর উপন্যাসে হিন্দুস্তানী দ্বারবানের কথা রয়েছে। হিন্দুস্তানী একটি ভাষাও বটে।

পণ্ডিতরা প্রাচীন হিন্দি আকারে ভাষার প্রথম লিখিত কবিতা, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে দিল্লির সুলতানি যুগে খুঁজে পান। দিল্লির সুলতানি সময়কালে, যা আজকের উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ নেপাল এর বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ছিল এবং যার ফলে উত্তর ভারতীয় সনাতনী ও দলিত সংস্কৃতি তুর্কি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, প্রাচীন হিন্দির প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভিত্তি ফার্সি থেকে ধার করা শব্দের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, যা বর্তমান হিন্দুস্তানি রূপে বিকশিত হয়। গান্ধীজি মনে করতেন নাস্তালিক ও নাগরী লিপিতে লেখা হিন্দুস্তানী ভারতের মিলনের ভাষা হতে পারে। ১৯০৪ সালে লাহোরে, একজন তরুণ বিপ্লবী এবং উপনিবেশবিরোধী কর্মী, হরদয়াল, ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে সমমনা ছাত্রদের জন্য একটি সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। তিনি তার বন্ধু, সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করা তরুণ কবি মুহাম্মদ ইকবালকে সমাবেশে আমন্ত্রণ জানান। ইকবাল সদ্য রচিত একটি কবিতা, 'হামারা দেশ' (আমাদের স্বদেশ) গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন, যার প্রথম লাইন ছিল 'সারে জাহান সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা' (সমগ্র বিশ্বের চেয়ে ভালো, আমাদের হিন্দুস্তান)। একজন শ্রোতা কবিতাটি লিখে তাৎক্ষণিকভাবে শীর্ষস্থানীয় উর্দু সাপ্তাহিক, ইতিহাদ-এ পাঠিয়ে দেন। এটি ১৯০৪ সালের আগস্টের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কে ছিলেন লালা হর দয়াল মাথুর? তিনি কেমব্রিজ মিশন স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে সংস্কৃতে স্নাতক ডিগ্রি এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর

ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০৫ সালে, তিনি সংস্কৃতে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বৃত্তি পানঙ্গ্লবোডেন স্কলারশিপ, ১৯০৭ এবং ক্যাসবার্ড এক্সিবিশনার, সেন্ট জনস কলেজ থেকে একটি জলপানি পান যেখানে তিনি অধ্যয়ন করছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন, যেখানে তিনি ইউনিয়নবাদে জড়িত হন। তিনি ফ্রিটজ উল্ফহেইমের বিশ্ব শ্রমিক সংঘ ত্যাগ করে জার্মানির কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগদানের পর একজন জাতীয় বলশেভিক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। লাল পতাকার ভ্রাতৃত্বের নীতিমালার রূপরেখা প্রদানকারী একটি বিবৃতি রচনা করেন। আর কবি মুহম্মদ ইকবালের কোনো পরিচয়ের দরকার নেই।

স্বনামধন্য উর্দু এবং ফার্সি কবি ছিলেন তিনি। ইকবালের সংগীত পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে ইকবালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'বাং-ই-দার'-এ এই সঙ্গীতটি প্রকাশিত হয়। সনাতনী ধর্মর দুটি কেন্দ্রীয় পবিত্র সত্তা হিমালয় এবং গঙ্গাকে হিন্দুস্তানের প্রাথমিক সংজ্ঞা হিসেবে এই সংগীত স্বীকৃতি দেয় মানুষ প্রথমে হিন্দুস্তানি এবং পরে মুসলমান বা হিন্দু। ইকবালের সে যুগের চিন্তায় ছিল ইতিহাসের এক চেতনা যাতে হিন্দুস্তান গ্রীক, রোমান বা মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক সভ্যতা ছিল। ইকবালের নিজের ১৯২৪ বাং-ই দারায় আরেকটি কবিতা রয়েছে, 'তারানা-ই মিলি' (কৌম সঙ্গীত), যা মুসলমান সমাজকে নির্ধারিত করেছে এক বৈশ্বিক সমাজ হিসাবে

'চিন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তান হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম, বতন হ্যায় সারা জাহান হামারা

ইকবালের চিন্তায় হিন্দুস্তান এবং মুসলমানের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ ছিল না । হিন্দুস্তান ছিল এক সভ্যতার আবাসভূমি আর মুসলমানের জন্যে ছিল সারা বিশ্ব। তাহলে আমি হিন্দুস্থানের কথা বললাম কেন ? হিন্দুস্তান এবং হিন্দুস্থান কি পৃথক সত্ত্বা ?

হিন্দুস্থানের ধারণা তৈরী করেন দামোদর সাভারকার , কবি , জাতপাত বিরোধী সংস্কারক এবং হিন্দু অধ্যাপত্যবাদের জনক। সাভারকর হিন্দুস্থানের ধারণায় গভীরভাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালে, তিনি মারাঠি ভাষায় 'আমুচা প্রিয়কর হিন্দুস্থান' (আমাদের প্রিয় হিন্দুস্থান) নামে তাঁর নিজস্ব কবিতা রচনা করেন এবং লন্ডনে এটি পরিবেশন করেন। সাভারকর ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর 'হিন্দুত্বের মূলনীতি' প্রবন্ধে মুসলিম আক্রমণকারীদের ধারণাটি বিস্তৃত করেছিলেন। প্রবন্ধটি ছিল 'হিন্দু' অর্থ কী তা সংজ্ঞায়িত করার, একটি নতুন শব্দ 'হিন্দুত্ব' তৈরি করার এবং এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুস্তানকে পুনর্নির্ধারণ ও পুনর্কল্পনা করার প্রচেষ্টা। 'হিন্দুত্বের মূলনীতি' প্রবন্ধে সাভারকর যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'হিন্দুস্থান' উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ নাম, এবং বহিরাগতদের দ্বারা প্রদত্ত কিছু নয় - তিনি 'হ' দিয়ে এটি বানান করতে বেছে নিয়েছিলেন যাতে ফারসি 'স্তান' (স্থান) এর পরিবর্তে লিপ্যন্তরিত সংস্কৃত প্রত্যয় -স্থান ব্যবহার করেন। আঠারো শতকের শেষের দিকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদদের বলেছিলেন যে 'হিন্দ' এবং 'হিন্দুস্তান' শব্দ দুটি বিদেশী শব্দ (মূলত সংস্কৃত নয়) যা পাহলভি বা প্রাচীন ফার্সি এবং পরে আরবি 'আল-হিন্দ' থেকে উপমহাদেশে প্রবেশ করেছে। সাভারকর এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করছিলেন ।তাঁর মতে মুসলমানদের আক্রমণ এবং তার প্রতিরোধে সেই সভ্যতার জন্ম দেয় যাকে সাভারকর 'হিন্দুত্ব' বলেছিলেন। সাভারকর এ ১০০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে মুসলিম শাসকদের সময়কালকে সংঘাতের সময় হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তার যুক্তি শেষে বলেছিলেন সমসাময়িক মুসলমানরা 'হিন্দুস্থান' এর বাইরে রয়ে গেছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 'হিন্দুস্থান'-এ জন্মগ্রহণকারী মুসলমানরা জোরপূর্বক ধর্মান্তরের ফলাফল এবং দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা অত্যাচারীর বিশ্বাসকে অভ্যন্তরীণ করে ফেলেছিল এবং 'হিন্দুস্থান'-এর প্রতি তাদের আর আনুগত্য ছিল না। হিন্দু হলেন যিনি ভাগ্ধতকে তার জন্মভূমি এবং পুণ্যভূমি বলে গ্রহণ করেন।

হিন্দুস্তান এবং হিন্দুস্থান দু বিপরীত ধর্মী ধারণা। আমি বাঙালি হলেও হিন্দুস্তানের প্রায় হাজার বছরের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। আমির খসরু থেকে , মির্জা গালিব যে সংস্কৃতির ধারা বহন করেছেন এবং সুভাষ বসু র শিষ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের আবিদ হাসান সাফরানি, (জন্ম নাম জাইন-আল-আবদিন হাসান) 'জয় হিন্দ' স্লোগানটি প্রবর্তন করেছিলেন, যার অর্থ 'বিজয় ভারতের',তার সঙ্গে একাত্ম বোধ করি। আমার কাছে হিন্দুস্থানের ধারণা এক আধিপত্যবাদী অনৈতিহাসিক ধারণা যা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সমন্বয় ধর্মী ধারণার বিরোধী। জয় হিন্দ।

(লেখক ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ ও মহাত্মা গান্ধি

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

এই নিবন্ধটির আগের দুই কিস্তিতে আমরা ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট. পার্টির প্রতিষ্ঠা, দেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম, পার্টির ওপর সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রধান ঘটনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি । এই সংখ্যা থেকে ভারতের কমিউনিস্টদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলব।

ভারতের কমিউনিস্টদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির সম্পর্ক

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে কী নীতি গৃহীত হবে তাই নিয়ে বিতর্ক চলছে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভারতের জনসাধারণের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনটির প্রধান নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি সম্পর্কে কী মনোভাব গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কের অবসান এখনও হয়নি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধি হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির এক খুনীর গুলিতে নিহত হন। এই হত্যার পরিকল্পনার পিছনে ছিল এক সুদুরপ্রসারী লক্ষ। এই শক্তি চেয়েছিল দেশ বিভাগজনিত পরিস্থিতিতে চরম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এই দেশকে একটি থিয়োক্রেটিক হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে। ওই সময় দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু জনস্রোত, কাশ্মীরে হানাদার আক্রমণ-এই সব চরম উদ্বেগজনক ঘটনা সত্ত্বেও দেশে ক্রমশ শান্তি ফিরে আসে। সংবিধান রচনা কারি গণ পরিষদে প্রায় তিন বছর আলোচনার পর ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ভারতবর্ষে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, বহুদলীয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই কাজ সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ গান্ধিজি ভারতে তিন দশকের বেশি সময় ধরে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন, সেই আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে বিপুল নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষে কমিউনিস্টরা কখনই একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হিন্দুত্ববাদী লক্ষকে সমর্থন করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সঙ্কটজনক সময়েও কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ও গান্ধিজি সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন পরিবর্তন করেননি।

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবশ্য কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যে গান্ধি,পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেসের অতীত ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গান্ধি বনাম লেনিন

এই নিবন্ধের আগের তিন কিস্তিতে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯২৫ সালে ভারতের মাটিতে জন্মের পর থেকে

ডাঙ্গে ১৯২১ সালে তাঁর লেখা 'গান্ধি বনাম লেনিন' বইটি প্রকাশ করেন। ওই সময় ভারতবর্ষে বসে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে এই ধরনের বই লেখা ছিল খুবই কঠিন। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তার 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' (Indian Struggle) গ্রন্থে এই বইটি সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন '১৯২৩ সালে যে সময় গোঁড়া গান্ধিবাদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যপন্থীগণ (নেতৃত্বে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই বছরেই গান্ধিবাদের বিরুদ্ধে আর একটা বিদ্রোহের জন্ম হয়, যা পরবর্তীকালে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। গান্ধিজির আদর্শবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে বোম্বাইয়ে শ্রী ডাঙ্গের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। তাদের নিজেদের একটি ক্লাব ছিল এবং সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য তারা সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন।' ১৯২৫ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় এবং ১৯৩৩ সালে পুনরায় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় প্রায় চার বছর বিচার চলবার পর শ্রীডাঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হন।' সুভাষচন্দ্র ডাঙ্গে সম্পাদিত 'সোসালিস্ট' পত্রিকা ও আলোচ্য বইটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ডাঙ্গে এই বইটিতে যা লিখেছিলেন তার থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'সংক্ষেপে বলতে গেলে গান্ধি এবং লেনিন উভয়েরই লক্ষ্য এক। এ যুগের সমস্ত সামাজিক অন্যায়কে ধ্বংস করা। বিশেষ করে গরিবের দুর্গতি নাশ করা এবং স্বৈরাচারের পতন ঘটানো।

গান্ধি — সমস্ত দুর্দশার মূলে বর্তমান সভ্যতা। বিশেষ করে আধুনিক শিল্পায়ন ও তার ফলে অমানবিকতা, অনাচার লেনিন- সমস্ত দুর্গতির মূলে রয়েছে ধনিকশ্রেণি কর্তৃক উৎপাদনের ব্যবস্থাদি দখল, ধনবৈষম্য ও তার ফলে সর্বহারাদের দারিদ্র বৃদ্ধি...'। ডাঙ্গে তাঁর এই গ্রন্থে গান্ধিজি এবং লেনিন উভয়ের লক্ষ্য এক বললেও, গান্ধিজির কর্মপন্থা ও আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর আস্থা ছিল

না। বহু বছর পর ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডাঙ্গে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রকে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন। তাতে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে গান্ধিজি ও কংগ্রেস সম্পর্কে আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের উপলব্ধিতে ভুল ছিল। ডাঙ্গে গোড়া থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করার কথা বলতেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কংগ্রেস হচ্ছে জনগণের সংগঠন এবং আমাদের উচিত এর মধ্যে থেকে কাজ করা এবং অবশেষে শ্রমিকশ্রেণির অর্থাৎ কমিউনিস্টদের এর অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করা।

মীরাট সামলার সময় কমিউনিস্টরা সেই ১৯২৯ সালে কেন শ্রমিক শ্রেণির ও ভারতীয় জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল, তার কারণ হিসাবে ডাঙ্গে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্রকে বলেন, ক্ষ্মতাঁরা অর্থাৎ জনগণ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির পার্টির দর্শনের সংযুক্তি লক্ষ্য করেছিল। জনগণ যখন জানলো মীরাট বন্দি কমিউনিস্টদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধি দেখা করেছেন তখন তারা 'উৎফুল্ল' হয়ে উঠেছিল। ডাঙ্গে বলেন, ১৯২৯-এর শেষে বা ৩০-এর গোড়ায় গান্ধিজি মীরাট জেলে এসে কমিউনিস্ট বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কমিউনিস্টদের এক অংশের তাঁর সম্পর্কে গোড়ামি থাকলেও তিনি এসেছিলেন ও সকলের সঙ্গে দেখা করেন। ডাঙ্গে, তিনি চলে যাওয়ার আগে তাঁকে বলেন, 'মহাত্মাজি, আপনি কী শীঘ্রই আবার একটি আন্দোলন শুরু করতে চলেছেন?' জবাবে গান্ধিজি বলেন, 'হ্যা'। ডাঙ্গে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন চৌরিচৌরার মতন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে কি তিনি আবারও আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন? যদি তিনি তা করেন 'তাহলে কিন্তু জনসাধারণ হতাশায় ডুবে যাবে'। গান্ধিজি জবাবে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন, যাই কিছু ঘটুক না কেন এবার আন্দোলন তিনি প্রত্যাহার করবেন না। গান্ধিজি কথা রেখেছিলেন। সোলাপুর ও পেশওয়ারে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি।'

ডাঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৩৬-১৯৩৯ এই কালপর্বে ভারতে কমিউনিস্টরা কমিনটার্ণের সাধারণ সম্পাদক জর্জি দিমিত্রভের প্রভাবে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ভিতর থেকে কংগ্রেসকে পরিবর্তন করতে হবে ও তাকে বামদিকে ঘোরাতে হবে। কিন্তু এই পর্বটুকু বাদ দিলে অধিকাংশ সময় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে থেকে গেল। এর ফলে কমিউনিস্টরা জনগণের রাজনৈতিক নেতা হতে পারল না। তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেই থেকে গেল। রাজনৈতিক প্রশ্নে 'আমরা' জনগণকে পরিচালনা করতে পারলাম না। কংগ্রেসকে আমরা সংকীর্ণ বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলাম এবং বললাম, 'কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করছে', ডাঙ্গে বলেন, এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফসল হল আমার প্রথম পুস্তিকা 'গান্ধি বনাম লেনিন।' ডাঙ্গের মতে, মহাত্মা গান্ধি গণ আন্দোলন থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর যে প্রবন্ধ দিয়ে ১৯৪২-এর আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল ' সিংহ কেশর নাড়াচ্ছে।' ডাঙ্গে মনে করেন, 'গান্ধিবাদীরাই গান্ধিকে চিনতে পারেননি। কারণ তাঁরা তাঁকে অহিংসবাদের গুরু হিসাবেই দেখেছেন। অন্যদিকে ডাঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ভাবেন, ' তিনি একজন প্রকৃত বিপ্লবী যিনি প্রয়োজন হলে হিংসাত্মক পথ গ্রহণে দ্বিধা করতেন না।' আগস্ট আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ সালে বন্দি গান্ধিজিকে যখন বড়লাট লিনলিথগো চিঠি দিয়ে জনসাধারণকে হিংসাত্মক কাজ পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করেন, তখন তার উত্তরে গান্ধিজি লেখেন এ হল সরকারের 'সিংহ সদৃশ হিংসার' (Leonine Violence) প্রত্যুত্তর ও জবাব। ডাঙ্গের মতে, গান্ধিজির রাজনীতি এবং রণনীতির মূল লক্ষ্যই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলুপ্তি। তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রটি একটি শয়তানের যন্ত্র। এই শয়তানকে ধ্বংস করাই ভারতীয় জনগণের কাজ। তবে শয়তানকে কীভাবে ধ্বংস করতে হবে সে সম্পর্কে গান্ধিজির নিজস্ব ধারণা ছিল। তাঁর নীতি ছিল শয়তানকে রক্তশূন্য করে ফেলতে হবে। শয়তানের দেহে এই রক্ত সঞ্চিত হয়েছে জনগণের সহযোগিতা ও ভীতির ফলে। এই ভীতি ভাঙতে হবে। আমরা নিরস্ত। তাই অসহযোগ আন্দোলনই আমাদের অস্ত্র। এটিই গান্ধিজির শিক্ষা। এই জন্যই তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী। ডাঙ্গে গান্ধিজির কমিউনিস্টদের সম্পর্কে মনোভাব বিষয়ে বিপানচন্দ্রকে বলেন, তিনি কখনও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি। যদিও কমিউনিস্টদের সহিংস পন্থা সম্পর্কে কখনও কোনও দিন সহমত পোষণ করেননি।

রাধারমণ মিত্রের কথা

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বন্দি রাধারমণ মিত্রের গান্ধিজি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ চমকপ্রদ। শ্রী মিত্র উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় শিক্ষকতা করতেন। ১৯২১ সালে গান্ধিজি ও কংগ্রেসের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরে এটোয়া ছেড়ে তিনি সবরমতি আশ্রমে চলে আসেন। তিনি লিখেছেন, এখানে তিনি গান্ধিজির অশেষ স্নেহ ভালবাসা পান যা তাঁর জীবনের অমূল্য স্মৃতি। কিন্তু রাধারমণ বাবু সবরমতির কঠোর শৃঙ্খলা ও কায়িক শ্রমের নিত্য কর্মসূচিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি অবশেষে পড়াশুনায়

মনোনিয়োগ করতে চান বলে গান্ধিজিকে জানান। তিনি রাধারমণকে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে চলে যেতে বলেন।তিনি গান্ধিজিকে জানিয়ে সবরমতি আশ্রম ত্যাগ করেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত হন। অবশেষে ১৯২৯ সালে গ্রেফতার হন ও মীরাট জেলে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। গান্ধিজি মীরাট জেলে কমিউনিস্ট বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে এলে রাধারমণ বাবু পিছন দিকে মাথা নিচু করে বসেছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি বলেন, 'রাধারমণ তুমি লুকিয়ে আছো কেন? তোমার অগৌরবের কিছু নেই। তুমি একটি আদর্শের জন্য বন্দি হয়েছো। নিজের কাজে এগিয়ে যাও।' গান্ধিজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় রাধারমন' মিত্রের দীর্ঘ স্মৃতিচারণে এই কাহিনি প্রকাশিত হয়। গান্ধিজির সঙ্গে রাধারমণ মিত্রের আমৃত্যু যোগাযোগ ছিল।

দেশের খবর

অসমে ভোটের ঢাকে কাঠি

কমলেশ গুপ্ত

অসমে বিধান সভার নির্বাচন হতে মাত্র দুমাস বাকি। শাসক বিরোধী সব দলই নির্বাচনের জন্য তৈরি হতে শুরু করেছে। বলা বাহুল্য যে ধনবল জনবলে শক্তিশালী শাসক পক্ষ সব দিক থেকেই আজকের তারিখে এগিয়ে রয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসন ক্ষমতা বিজেপির হাতে। সেই ক্ষমতা ভোটে জেতার কাজে ব্যবহার করতে তারা সিদ্ধহস্ত। রাজ্যে নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা, নির্বাচনের আগে লক্ষ লক্ষ হিতাধিকারীকে নগদ টাকা বিতরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একেবারে সন্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিটি সভায় শুধু বক্তৃতা নয়, নিজ হাতে হিতাধিকারীদের মধ্যে প্রকল্পের টাকা বিলি করছেন, নিযুক্তি পত্র বিতরণ কর্মসূচী রূপায়ণ করছেন। বিভিন্ন জেলায় পর্যায়ক্রমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ভূমি পূজন করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দফায় দফায় অসম ভ্রমণ করছেন।এই ভ্রমণ আসলে সরকারি খরচে নির্বাচনী প্রচারে সীমাবদ্ধ থাকছে। গুয়াহাটিতে বড়ো জনগোষ্ঠীর বসন্তকালীন লোকনৃত্য বাগুরুমবা উপভোগ করতে এসে বিরোধীদের আক্রমণ করতে ভোলেননি। দুজনের বক্তৃতায় সেই একই সুর। জনসাধারণের আবেগকে সারথি করে বিজেপির সেই ২০১৬ এবং ২০২১ সালের রাজনৈতিক শ্লোগান গুলোকেই এবারের নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করে গেলেন । সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ভিত্তিতে ভোট বিভাজনের রাজনীতি বিজেপি দলকে ২০১৪ সাল থেকেই একাধারে লাভবান করে এসেছে। এখনো তাঁরা বিহারের নির্বাচনের মতো এখানেও 'ঘুসপেটীয়া' আওরে যাচ্ছেন।মোট কথা রাজ্যজুড়ে শাসক পক্ষের উদ্যোগে নির্বাচনী আবহাওয়া প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তার বিপরীতে বিরোধী পক্ষের বিক্ষিপ্ত আয়োজন চলছে। স্বাভাবিক ভাবেই শাসকদের তুলনায় বিরোধীদের সক্রিয়তা কম। বিরোধী ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে ঠিক , কিন্তু তার কোন স্পষ্ট কর্মসূচী মানুষের কাছে এখনো তুলে ধরা হয়নি। কার্যক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্যের প্রচেষ্টা এখনও সপ্রতিভ হয়ে ওঠেনি। প্রস্তাবিত বিরোধী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সচেতন মহলে এবং বিজেপি বিরোধী নাগরিক সমাজের নেতৃত্ব উপলব্ধি করেছে। কিন্তু তাকে এখনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব গুরুত্বসহকারে নেয়নি বলেই অনুভব হয়। বলতে গেলে প্রায় সব বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা রাজ্যের বাস্তব অবস্থা গভীর ভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন বোধ হচ্ছে না। যদি হতেন তাহলে কেবল সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় না হয়ে কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় হতেন। দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো নেতা মুখে বিরোধী ঐক্যের কথা বলছেন আবার নিজের দলের প্রার্থী ঘোষণাও করেছেন। এই ধরনের সমন্বয়ের অভাবকে বিজেপি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ করছে। ফলে বিরোধী শক্তি নিয়ে নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত কংগ্রেসের ভূমিকা অত্যন্ত নিরাশা জনক। এখন নির্বাচনের রাজনীতিতে বিজেপি কংগ্রেসের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে।

এই সময়ে বিরোধী শক্তি অসমের জনসাধারণের দাবিগুলো নিয়ে যেমন ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতির মর্যাদা, অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা, সাংবিধানিক সুরক্ষা,এন আর সি ,নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, কৃষি ভূমি সুরক্ষা, শ্রমজীবীর কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় গুলো নিয়ে জনমত গঠনে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে কি? জনসাধারণ তাদের মৌলিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে নির্বাচনে প্রতিষ্ঠান বিরোধী স্থিতি নেবে এমন আশা নিয়ে আছেন বিরোধীরা। অনেকে আবার জুবিন গার্গের রহস্যময় মৃত্যুর ন্যায়বিচারের দাবি বিরোধীদের নির্বাচনে পরোক্ষভাবে হলেও সাহায্য করবে বলে আশা করছেন। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে অনেকটাই। সাধারণ মানুষের চিন্তা -চেতনাকে অতি কৌশলে নিয়ন্ত্রণে আনতে বিনা মূল্যে রেশন, বিকাশ-উন্নয়নের চমকে মানুষকে দিকভ্রান্ত করার পথ নিয়েছে বিজেপি।এই প্রেক্ষাপটে বিরোধী ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তার কোন বিকল্প নেই।

--দুই --

নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে ভোটে জেতানোর অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।ভারতের অন্যান্য রাজ্য যখন ভোটার তালিকা সংশোধনীর এস আই আর চলছে অসমে চলছে এস আর, বিশেষ সংশোধন। এস আর এর নামে শাসক বিজেপি দল ভোট চুরির গভীর ষড়যন্ত্র করছে এমন অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে রাজ্যের ৬০ টি বিধান সভা কেন্দ্রে নির্বাচনের প্রাকমূহুর্তে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ভোটারদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিজেপি বিরোধী ভোটারদের নাম কাটার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।এভাবে ভোট চুরি করে দিশপুরের মসনদে বসতে চাইছে এমন অভিযোগও উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হচ্ছেন শুনানি কেন্দ্রে।একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অদৃশ্য অভিযোগকারীরা (পড়ুন বিজেপি কর্মী) মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং অনাবশ্যক অভিযোগের ভিত্তিতে কেবল সংখ্যালঘু পরিবারের নয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পরিবারেও সংশোধনীর নামে নোটিশ পাঠাচ্ছে। এভাবে কেন্দ্র পিছু কম পক্ষে দশ বারো হাজার মানুষকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। সাকুল্যে প্রায় ৩০ লক্ষ ভোটারের নাম কাটার জন্য সন্দেহ জনক আবেদন জমা পরেছে বলে খবরে প্রকাশ। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র সাত লক্ষের শুনানি বা অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।বাকি ২৩ লক্ষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে কিনা তা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা রয়েছে। এভাবে ঘুরপথে নাম কাটার পরিকল্পনা রয়েছে বলে অনুমান করে নিয়েছে সচেতন মহল।বিভিন্ন শুনানি কেন্দ্রে এখন যুদ্ধ সদৃশ পরিস্থিতি। হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি চলছে ,আহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন।জীবিত এবং উপযুক্ত ভোটারদের মৃত, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, স্থানান্তরিত ঘোষণা করে নোটিশ যাচ্ছে ভুরি ভুরি। বিএলওদের ওপর নাম খারিজের চাপ বাড়ছে । সংবিধান প্রদত্ত্ব ভোটাধিকার হারানোর আশংকায় শুনানিতে অংশ গ্রহণের জন্য মানুষ ছুটছেন।বি এল ওরা সংশোধনীর কাজ করার পর আবার অভিযোগ করার সুযোগ এবং বিশেষ করে মুসলিম বি এল ওদের কাজ পুনর্বার পরীক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শাসক দলের অদৃশ্য অভিযোগকারীদের। এভাবে ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি উঠেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও। তবে এতো কম সময়ে সব শুনানি শেষে না হবার আশংকা রয়েছে। ফলে ভোটাধিকার হারাবেন অনেক নাগরিক।নির্দৃষ্ট সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ না হলে সময়সীমা। বৃদ্ধির দাবি করা হচ্ছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে বিজেপি ক্ষমতা হারানোর ভয়ে শংকিত হয়ে এক সাথে সব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে। তার বিপরীতে বিরোধী দলগুলোর মজবুত ঐক্যই হতে পারে যুদ্ধজয়ের আয়ুধ। অসমের সচেতন নাগরিক তার অপেক্ষায় আছে।

--তিন --

এবারের এস আরকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে ভুল হবে।২০২৩ সালে অসমের বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রের সীমা পুনর্বিন্যাসের (Delimitation) পর এই এস আর করা হচ্ছে। সমষ্টি বা কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা ছিল খুবই গোলমেলে, অবাঞ্ছিত এবং বিতর্কিত। সংবিধান মতে পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে হচ্ছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, ভৌগলিক সংলগ্নতা এবং ভোটারদের সুবিধা রক্ষা করা। কিন্তু অসমে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি।বহু পুরোনো কেন্দ্র বিলুপ্ত এবং এমনভাবে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে যে সমষ্টি গুলোর জনবিন্যাস সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ধুবড়ি,বরপেটা, গোয়ালপাড়া,নগাঁও, দরং, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি প্রভৃতি সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলগুলো কিছু ক্ষেত্রে যুক্তিহীন ভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে। কিছু বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের দূরবর্তী এবং ভিন্ন জনবিন্যাস থাকা অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এভাবে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমা পুনর্বিন্যাসের ফলে কিছু কেন্দ্রের সংখ্যালঘুদের এক একটি কেন্দ্রে রাজনৈতিক ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা হলো। কিছু কেন্দ্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা হ্রাস করে অন্য সমষ্টিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কেবল সংখ্যালঘু বসতি প্রধান অঞ্চলে নয় আপার অসমের আহোম, মরান মটকে প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থাকা সমষ্টির সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। বরাক উপত্যকার সমষ্টির সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। অসমের বিরোধী দলগুলো জনগননার পর কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পুর্ন করার দাবি করেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন শুধু মাত্র কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ইংগিতে পুনর্বিন্যাস করেছে। এই পুনর্বিন্যাস কেবলমাত্র শাসক বিজেপি দলের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ পূর্ণ করছে।

কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের পর ভোটার তালিকা থেকে একটি বড়ো অংশ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। আসলে এটা সংগঠিত ভোট চুরি। এভাবে জালিয়াতির অভিযোগে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানির ক্ষেত্রে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা হারাচ্ছে।

--চার--

ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনকে (এস আর) কেন্দ্র করে রাজ জুড়ে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকার সময় কামরূপ জেলার বকোতে জেলা পরিষদের সদস্য প্রহ্লাদ বিশ্বাস, দক্ষিণ কামরূপ জেলার বিজেপি দলের সম্পাদক মৃণ্ময় বড়ো,ঐ দলের জনজাতি সেলের সম্পাদক বুদ্ধেশ্বর রাভা, দলের দুই কর্মী মৃদুল তালুকদার এবং দীপক

রাভা রাতের আধারে কো-ডিষ্টিক্ট কমিশনের কার্যালয় দখল করে নির্বাচন বিভাগের কম্পিউটার ব্যবহার করে ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার অথবা সংযোজন করার জন্য ব্যবহার করা ৭নম্বর ফর্ম পূর্ণ করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে।এর বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিজেপির নেতা কর্মীরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভূলুণ্ঠিত করেছে এমন অভিযোগে উঠেছে।'ভোট চোর বিজেপি' কর্মীদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে। বকোর স্থানীয় মানুষ এবং সাংবাদিকদের তৎপরতায় বিজেপি কর্মীদের কুকর্মের ঘটনা সামনে এসেছে। এঘটনা বেশ কিছুদিন ধরে চলার অভিযোগ উঠেছে।

এভাবে গণতন্ত্রের মন্দিরে লুটপাট চালানোর পরও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গণমাধ্যমে নির্লজ্জ ভাবে বলেছেন ভোটার তালিকা সংশোধনীর নামে একজনো হিন্দু অথবা ভূমি পুত্র কে নোটিশ দেওয়া হয় নি।বঙ্গমূলীয় মুসলমানদের আমরা বিরক্ত করবই। সাংবিধানিক পরিসীমার বাইরে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ কে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অন্যতম রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এর বিরুদ্ধে অসমের বাম দল গুলো রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে পথে নেমে প্রতিরোধ গড়ছে। ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার দিন থেকেই শুরু হচ্ছে রাজ্যজুড়ে ভোট চুরি আর হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই। কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল গুলো রাস্তায় নামছে। সবমিলিয়ে অসমে বসন্তেই গরম হাওয়া বইছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র জন অসন্তোষ

অমিতাভ সিংহ

প্রায় বছরখানেক ধরে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ চরমে উঠেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর প্রতিশোধমূলক বক্তব্য ও আচরণ ছাড়াও দেশের সবথেকে স্বেচ্ছাচারি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। কিষাণ সম্পদ প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের। এর অর্থ কৃষকদের বিভিন্ন ব্যবসা বা কৃষিতে বিনিয়োগ করা যায়।একটি সমীক্ষা সংস্থা ২০২১ সালে একটি সমীক্ষা করে রিপোর্ট প্রকাশ করে হেমন্তর স্ত্রী রিঙ্কি ও পুত্র নন্দিলের নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ২৯ বিঘা জমি দখলের অভিযোগ আনে। সম্প্রতি ক্রুশকারেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান তথ্যের অধিকার আইনে কিছু প্রশ্ন করে। জানা যায় যে রিঙ্কি বিশ্বশর্মা ও নন্দিল বিশ্বশর্মার সংস্থা প্রাইড ইষ্ট এন্টারটেইনমেন্ট ৫০ বিঘা জমি ক্ষমতার জোরে কিনে তা দেখিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কিষাণ সাহায্য যোজনার ১০ কোটি টাকা সরকারি সাহায্য হস্তগত করেন। উপরিউক্ত সংস্থাটির নাম দেখেই তাদের সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরী করা যায়। আসলে এই সংস্থাটির কাজ হল সিনেমা,সিরিয়াল,টিভি চ্যানেলের মত বিনোদনমূলক কাজ করা, কখনো চাষবাস বা চাষীদের উপকারের জন্য কোন কাজ এরা করেনা। বোঝাই যাচ্ছে কেন্দ্রের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরে প্রভাব খাটিয়ে এই সরকারি সাহায্য হস্তগত করা হয়েছে। এইধরনের বহু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত অমিত শাহের নয়নের মণি হেমন্ত বিশ্বশর্মা।

হেমন্ত বিশ্বশর্মার মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে সাধারণভাবে অসমবাসী একেবারেই খুশী নয়। এমনিতে এনআরসির নামে কয়েক লক্ষ মানুষের বিষয় অমীমাংসিত।অনেকে আজ ডিটেনশন ক্যাম্পে,যার বেশীরভাগই হিন্দু। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করতে গিয়ে তিনি ফেঁসে গেছেন।তাও তার হামবড়াভাব যাচ্ছে না।এখনও বলে চলেছেন এস আর - এ হিন্দুদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে না,শুধু বাংলাভাষী মিঞাদের নোটিশ পাঠাচ্ছি।যেন তিনি নিজেই নির্বাচন কমিশন।হেমন্ত বলেছেন আমার আমলে তাদের দুর্যোগ পোয়াতে হবে,দেশও ছাড়তে হবে।আমরা উৎপাত করব। ৭ নম্বর ফর্মে জীবিত ভোটারদের নাম বাতিলের যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি তাদের হয়রানি করার জন্য। এইভাবেই নির্বাচন কমিশনের ৭ নং ফর্মের অপব্যবহার হচ্ছে অসমে।নির্বাচন কমিশন তার এই চক্রান্তের শরিক হচ্ছে।

সম্প্রতি অসমের সাংস্কৃতিক জগতের আইকন জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। জুবিন বিভিন্ন সময়ে খোলাখুলিভাবে সরকারের বিভিন্ন কার্যধারার সমালোচনা করেছিলেন। তাই কি তিনি প্রতিশোধস্পৃহা ও চক্রান্তের শিকার? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠে গেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে তার পেছনে থাকার কোনও সংকেত নেই। কেন? পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট কেন প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না? জনশ্রুতি আছে সরকারের মেডিক্যাল টিম নাকি পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট পাল্টে দিতে চাপ দিয়েছিল। যদি এই মৃত্যু স্বাভাবিকই হয় তাহলে তা জনসমক্ষে আনতে সরকার কেন ভয় পাচ্ছে সেই জিজ্ঞাস্য সাধারণ মানুষের। কেন তার মোবাইল ফোন কদিন ধরে খুঁজে পাওয়া গেল না? তাহলে কি এর মধ্যে তার ফোনের কল রেকর্ড ও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথোপকথন মুছে ফেলার জন্যেই ফোন খুঁজে না পাওয়ার এই নাটক? জানা গেছে অভিযুক্তদের সঙ্গে রাজ্যের সব

চাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগাযোগ রয়েছে।কেউ তাদের ব্যবসায়িক সহযোগী,কেউ বা তাদের বন্ধুস্থানীয়।তাই হেমন্ত বিশ্বশর্মা সরকার এই রহস্য সন্ধানে সিট বা সিবিআই তদন্তের অনুমোদন দেয় নি,আর এদিকে বলে যাচ্ছেন সুষ্ঠ তদন্তের পর দোষীরা ছাড়া পাবে না।যেখানে সুষ্ঠ তদন্তই হচ্ছে না দোষী সাব্যস্ত হবে কিভাবে? জনরোষ সামলাতেই তার এই প্রতিশ্রুতি তা সবাই বুঝতে পারছেন।

বাস্তবতা হল ক্রমবর্ধমান জনরোষ যা বিজেপিকে নির্বাচনের আগে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে।প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা, আইনশৃঙ্খলায় অবনতি,বেড়ে চলা বেকারত্ব,মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষমতার অপব্যবহার তৃণমূলস্তরে জনতার ক্রোধের কারণ।জনতা তিতিবিরক্ত এই সরকারের কাজকর্মে । তাই অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান কেন্দ্রীয় বন্দর,জলপথ ও জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়ালের একটি চিঠি যা দলের সভাপতিকে লেখা হয়েছে তা বাজারে এসেছে তাতে তিনি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে বলেছেন যে এর ফলে বিজেপি কর্মীদের মনোবল তলানিতে এসে পৌঁছেছে।সমর্থকেরা খোলাখুলিভাবে তাদের হতাশা প্রকাশ করছে। তাই হেমন্তকে সরিয়ে এখনই একজন স্বচ্ছ ও কার্যকরী ভাবমূর্তিসম্পন্ন কোন নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সামনে আনা প্রয়োজন। যদিও চাপে পড়ে সোনওয়াল এই চিঠির কথা অস্বীকার করেছেন।

নির্বাচন কমিশন ও এসআইআর

মজিবুর রহমান

১৯৪৬-৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে এটাও স্থির হয়ে যায় যে, স্বাধীন ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হল জনপ্রতিনিধি নির্বাচন। নির্বাচনে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তথা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকে। কোটি কোটি মানুষের অংশগ্রহণ থাকা নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ও যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা থাকা দরকার। এই ৯ভাবনা থেকেই ভারতের সংবিধান প্রণয়নের কাজে নিযুক্ত গণপরিষদ সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে ৩২৪ থেকে ৩২৯ ধারার মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে আলোকপাত করে। নির্বাচন কমিশন গঠন ও তার কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ অংশের পরিপূরক হিসেবে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন রচিত হয়।

সংবিধানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়। তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারও নিয়োগ করতে পারেন। ১৯৮৯ সালে নবম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার মাত্র একদিন আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অধীনে প্রথম বারের মতো আরও দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারি ওই দুজন নির্বাচন কমিশনারকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে নির্বাচন কমিশন পুনরায় তিন সদস্যবিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত হয়। নির্বাচন কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হলে আর ওই পদে থাকা যায় না। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সহজেই বরখাস্ত করার নিয়ম থাকলেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করার জন্য সংসদে অভিশংসন প্রস্তাব (ইম্পিচমেন্ট মোশন) পাস করতে হয়।

নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য নির্বাচনের ঠিক পূর্বে আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করা যায়। যেমন, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দুজন এবং অষ্টম লোকসভা নির্বাচনে ছজন আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ ৬ মাস। নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে তাঁদের নিয়োগ করা হয় এবং নির্বাচনের পর তিন মাস পর্যন্ত তাঁরা ওই পদে আসীন থাকেন। বর্তমানে প্রতি রাজ্যে একজন করে পূর্ণ সময়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার--সিইও) রয়েছেন। তিনি নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার-- ডিইও) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই পদে কোনো পৃথক ব্যক্তি নিযুক্ত হন না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরাই সাধারণত ডিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে ডিএম, এসডিও, বিডিও-রা ভোটের সময় বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মহকুমা শাসকদের 'ভোটার তালিকাভুক্তি আধিকারিক' (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার--ইআরও) এবং ব্লক পর্যায়ের কর্মীদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) হওয়ার কথা। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা বুথ লেভেল অফিসার-- বিএলও হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও প্রতিটি নির্বাচনের সময় কয়েক লাখ সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ভোট গ্রহণ ও গণনা করার জন্য নিযুক্ত হন। সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল পার্লামেন্ট, রাজ্য-আইনসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সংক্রান্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান (সুপারিনটেনডেন্স), নির্দেশনা (ডাইরেক্টশন) ও নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোল) করা। নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকা (ইলেক্টোরাল রোল) প্রণয়ন, খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ। সংবিধান প্রবর্তনের সময় ভোটদাতার ন্যূনতম বয়স ছিল ২১ বছর। ১৯৮৮ সালে ৬১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বয়ঃসীমা হ্রাস করে ১৮ বছর করা হয়। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীকৃতিদান ও তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার, প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ এবং বিজয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করে।

নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রথমে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের হাতে অর্পণ করা হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ১৯তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

নির্বাচনে 'অসাধু আচরণ' তথা উৎকোচ প্রদান, ভোটারদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোটকেন্দ্র থেকে ভোটপত্র অপসারণ প্রভৃতি কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন যে কোনো নাগরিকের ভোটাধিকার ৬ বছরের জন্য কেড়ে নিতে পারে। অসাধু আচরণ করার জন্য শিবসেনার শীর্ষ নেতা বালা সাহেব ঠাকরে একবার তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। কোনো আদালত কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ বা দুর্নীতিমূলক আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। এই আইনের প্রয়োগ ঘটেছিল লালু প্রসাদের ক্ষেত্রে।

ভোট প্রদানের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন ছাড়া সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে পারে না। এজন্য মাঝেমধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষনের আমলে (১৯৯০-৯৬) একাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন হতে দেখা যায়। যেমন, আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আদর্শ আচরণবিধি (মডেল কোড অব কন্ডাক্ট) কার্যকর করা হয়। প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হয়। প্রচারণায় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণ ভিত্তিক মন্তব্য নিষিদ্ধ করা হয়। ভোট প্রচারের সময় মন্ত্রিসভা তথা আইনসভার সদস্যদের সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৯৩ সালে সকল ভোটারের জন্য সচিত্র পরিচয় পত্র বা এপিক চালু করা হয়। এখন ভোটার লিস্টেও ভোটারের ফটো থাকে। বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়েও একজন ভোটারের কোনও প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইভিএম-এ 'নোটা' বোতাম সংযুক্ত করা হয়। ভিভিপ্যাট থেকে ভোটার দেখে নিতে পারেন তিনি যে প্রার্থীকে ভোট দিলেন তিনিই সেই ভোট পেলেন কিনা। আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটপ্রদান পর্ব শেষ হবার অব্যবহিত পরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই ভোট গণনা করা হতো, এখন তা দিনকয়েক পর বিডিও অফিসের তত্ত্বাবধানে করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২৫শে জানুয়ারি 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন বা রিভিশন করে। বর্তমানে এই ত্রৈমাসিক প্রক্রিয়ায় নতুন ভোটারদের নাম সংযোজন এবং মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বিয়োজন করা হয়। এই একই কাজ বৃহৎ আকারে 'নিবিড় সংশোধন' বা ইনটেনসিভ রিভিশন (আই আর) নাম দিয়ে ১৯৫২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ৮ বার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শেষ বারের মতো হয় ২০০২ সালে। পূর্বতন 'আই আর' ২০২৫ সালে বিহার থেকে 'এস আই আর' বা 'স্যার' হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 'স্যার'-এর উদ্দেশ্য একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির থেকেও বেশি কিছু বলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন যেকোনো মূল্যে এরাজ্যে বিরাট সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমত, 'স্যার'-এর জন্য নথিপত্রের (ডকুমেন্টস) যে তালিকা নির্ধারণ করা হয় তা এ রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সকল সরকারি-বেসরকারি কাজে বহুল ব্যবহৃত আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড 'স্যার'-এ ব্রাত্য করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আধার কার্ডকে মান্যতা দিলেও তার সঙ্গে নাগরিকত্বের প্রশ্নটি জুড়ে দেওয়ার ফলে বিভ্রান্তি ও বিতর্কের অবসান ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে গণ্য করা হয়। ২০০২ সালের পূর্বের অথবা ২০০২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের ভোটার তালিকাগুলোর একটিও গ্রহণযোগ্য হয়নি। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই অযৌক্তিক। তবুও বুথ লেভেল অফিসারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ পড়া ছাড়া বাকি সবকিছু মোটামুটিভাবে ঠিক আছে। নির্বাচন কমিশনের উচিত ছিল মতুয়াদের সমস্যাটির সমাধান সহ খসড়া তালিকা সামান্য

ঝাড়াই-বাছাই করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা। কিন্তু তা না করে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির'র নামে ইললজিক্যাল অ্যাকটিভিটি শুরু করা হয়েছে। প্রতি সাতজনের মধ্যে একজনের নাম সন্দেহের তালিকায় উঠেছে। বেশকিছু বুথে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটারকে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। 'যৌক্তিক অসঙ্গতি'-র অযৌক্তিকতার কারণে অশীতিপর-নবতিপর নাগরিক, রাজ-কেন্দ্র সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এবং সাংসদ-বিধায়কদের শুনানিতে ডাক পড়ছে। হিয়ারিং-এর নামে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ 'ডি-ভোটার' হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে। নির্বাচন কমিশন কার্যত 'নির্যাতন কমিশন' হয়ে উঠেছে। কমিশনের নিত্যনতুন নির্দেশ কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়ে তথা অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক বিএলও আত্মহত্যা করেছেন। অনেক জায়গায় বিএলও-রা গণইস্তফা দিয়েছেন। অনেক সাধারণ মানুষ এসআইআর আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অথবা আত্মহত্যা করে বসছেন। শুনানি কেন্দ্রগুলোতে মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। একটা ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে এরাজ্যে এমন লঙ্কাকাণ্ড এর আগে কখনও ঘটেনি। ঘোষিত উদ্দেশ্যের আড়ালে কমিশনের অন্য অভিসন্ধি রয়েছে বলেই এমনটি ঘটছে। তাছাড়া এখন যেহেতু ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার ব্যবস্থা রয়েছে সেহেতু আড়ম্বরপূর্ণ 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয় সেদিকেও কমিশনকে নজর দিতে হবে। কমিশন 'লক্ষ্মণ রেখা' মেনে কাজ না করলে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। কমিশনকে বাস্তবসম্মত নিয়মাবলি ও নির্দেশাবলী জারি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সেই কাজে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

(লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

জিম নওয়াজের এস.আই.আর শুনানি বয়কট

নিজস্ব প্রতিনিধি : একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নির্বাচন কমিশনের 'সংবিধান বিরোধী' SIR প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে সচেতনভাবেই শুনানিতে অনুপস্থিত থেকেছেন সমাজকর্মী জিম নওয়াজ। কিন্তু কেন? এক ফেসবুক পোস্টে যুক্তিসঙ্গত কারণ সহ বিস্তারিত লিখেছেন তিনি। ভাবনার পাঠকদের উদ্দেশ্যে হুবহু তুলে ধরা হল জিম নওয়াজের প্রোফাইল থেকে। (উল্লেখ্য, জিম নওয়াজ ইতিমধ্যে গত ২৩ জানুয়ারি সুপ্রিমকোর্টে গিয়ে লজিকহীন 'লজিকেল ডিস্ক্রিপেন্সি'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।)

নির্বাচন কমিশনের নোটিশ অনুযায়ী গতকাল অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি আমার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। শুনানিতে উপস্থিত হইনি। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমি ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সংবিধান বিরোধী প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে সচেতনভাবেই শুনানিতে অনুপস্থিত থেকেছি।

আমায় পাঠানো নির্বাচন কমিশনের নোটিশটি হল, অন্ধকারের পরোয়ানা। নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছে, আমি যাঁকে আব্বা বলেছি, তাঁকে নাকি আরও ছয়জন ব্যক্তি আব্বা বলে দাবি করেছেন! অথচ সেই ছয়জনের নাম, এপিক নম্বর সহ অন্যান্য কোনো তথ্যই নোটিশে নেই। Supreme Court Mohinder Singh Gill Chief Election Commissioner (১৯৭৮) মামলায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, প্রশাসনিক আদেশ বা নোটিশকে অবশ্যই specific and speaking হতে হবে, অর্থাৎ অভিযোগে সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তি গোপন রেখে আমাকে শুনানিতে ডাকা আসলে আমায় অন্ধকারে রেখে বিচার করার সামিল।

আমি যদি শুনানিতে যেতাম, তবে সেই আধিকারিককে কীভাবে সন্তুষ্ট করতাম যে আমার বাবা আমারই বাবা? কোনো প্রকাশিত Standard Operating Procedure (SOP) নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে হাজারো আধিকারিক শুনানি করছেন। কোনো SOP না থাকায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। সমমানের নোটিশের ক্ষেত্রে কৈখালী আর কাঁকিনাড়ার ভিন্ন ভিন্ন আধিকারিক নিজের মর্জিমাফিক, নিজের লজিকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। এটি সরাসরি Article ১৪-এর সমতার অধিকার লঙ্ঘন করে। Maneka Gandhi Union of India (১৯৭৮) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে fair– just and reasonable হতে হবে। SOP ছাড়া শুনানি আসলে বা executive tyranny বা প্রশাসনিক স্বৈরাচার।

SIR প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ প্রদান এবং ভেরিফিকেশন পরবর্তীতে খসড়া তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করার পরেও কমিশন কোনো গেজেট নোটিফিকেশন ছাড়াই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সি' নামক একটি অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আমায় নোটিশ ধরিয়েছে। Harla State of Rajasthan (১৯৫১) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, কোনো আইন বা নিয়ম জনগণের ওপর

প্রয়োগ করার আগে তা অবশ্যই promulgated বা প্রকাশিত হতে হবে। গোপন অ্যালগরিদম দিয়ে নাগরিকের পরিচয় যাচাই করা সংবিধানবিরোধী।

প্রমাণের দায়ভার নিয়েও প্রশ্ন আছে। খসড়া তালিকায় আমার নাম আসার পর কমিশন যখন নতুন করে আমাকে অভিযুক্ত করছে, তখন প্রমাণের দায়ভার কমিশনের ওপরই বর্তায়, আমার উপর নয়। State of Punjab Baldev Singh S1999) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, অভিযোগকারী সংস্থার ওপরেই প্রমাণের দায়ভার থাকে। এখানে কমিশনই অভিযোগকারী, তাই প্রমাণের দায়ভার আমার ওপর চাপানো আইনের শাসনের পরিপন্থী।

সবশেষে, বাবার পরিচয় নিয়ে অস্পষ্ট প্রশ্ন তোলা কেবল ভোটাধিকারের লড়াই নয়, এটি আমার সামাজিক মর্যাদার লড়াই। সংবিধানের Article ২১ আমাকে দিয়েছে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার। K.S. Puttaswamy Union of India (২০১৭) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ব্যক্তিগত মর্যাদা ও পরিচয় সংবিধানের মূল সুরক্ষার অংশ। কোনো গাণিতিক ভুল বা অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার দায় চাপিয়ে একজন নাগরিকের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা সংবিধানের সরাসরি লঙ্ঘন।

পুনশ্চঃ আমি নিজেকে মহান অথবা তিসমার খাঁ প্রমাণ করতে শুনানিতে উপস্থিত হইনি, বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। ইতিপূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলাম, নির্বাচন কমিশনকে আমি নোটিশের কোনো উত্তর দেবো না, নতুন করে কোনো ডকুমেন্টস দেবো না। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবো। আমি আমার নিজের অবস্থানে অনড় থেকেছি, ভবিষ্যতেও থাকবো। আমি একটি অসাংবিধানিক ও অস্বচ্ছ পদ্ধতির অংশ হতে অস্বীকার করছি, যেখানে অভিযোগ অস্পষ্ট সেখানে শুনানি কেবল একটি প্রহসন। আমি সুপ্রিম কোর্টে এই লড়াই লড়ছি যাতে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কোনো বাঙালি তথা ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় নিয়ে ছিনিমিনি না খেলা হয়। আমার অস্তিত্ব কোনো যান্ত্রিক লজিকের ওপর নির্ভর করে না, আমার অস্তিত্ব সংবিধানের রক্ষাকবচে সুরক্ষিত।

#JusticeForVoters #ConstitutionalRights #ElectionCommission #Article21 #Article14 #SupremeCourtOfIndia #BLO #WestBengal #SIR #sirhearing #LogicalDiscrepancy #ZimNawaz #socialactivist #Vabna

সোমনাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে নেহরুকে নিয়ে মোদীর অপপ্রচার ও ঐতিহাসিক সত্য

শুভাশিস মজুমদার

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের ক্রমাগত অপপ্রচারের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সম্প্রতি সোমনাথ মন্দিরে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীর পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতি অভিযোগের আঙুল তোলা। এর চিরাচরিত উদ্দেশ্য পন্ডিত নেহরুকে হিন্দু ধর্মের বিরোধী (পড়ুন 'শত্রু') হিসাবে উপস্থাপিত করে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়া। এটা করতে গিয়ে স্বভাবতই মোদী ঘটনাটির অগ্রপশ্চাৎ উল্লেখ করেননি। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর যে যুক্তিগুলো এই প্রসঙ্গে ছিল, তা' মোদী গোপন করলেন।

প্রসঙ্গত, সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজিই প্রথম সর্দার প্যাটেল এবং কেএম মুন্সি (স্বাধীনতা সংগ্রামী, গণপরিষদ সদস্য, নেহরু মন্ত্রীসভার কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী)-কে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সোমনাথ মন্দিরটি সরকারি অর্থে নয়, ব্যক্তিগত অনুদান সংগ্রহ করে পুনর্নির্মাণ করা উচিত। এই বিষয়ে, বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, পন্ডিত নেহরুর সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রতি কোন বিরোধিতা ছিল না, কিন্তু মন্দির পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে সরকারি পৃষ্ঠোপোষকতার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি।

১৯৫১ সালের ২রা মার্চ, ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখেছিলেন যে তাঁকে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠানে নিজেকে যুক্ত করতে কোনও আপত্তি দেখছেন না। কারণ তিনি বিভিন্ন 'মন্দির পরিদর্শন করেই থাকেন'।

নেহরু একই দিন তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন— 'আমার প্রিয় রাজেন্দ্র বাবু, আমি স্বীকার করছি যে সোমনাথ মন্দিরের একটি দর্শনীয় উদ্বোধনের সাথে আপনার নিজেকে যুক্ত করার ধারণাটি আমার পছন্দ নয়। কারণ, এটি কেবল একটি মন্দির পরিদর্শন নয়, যা অবশ্যই আপনি বা অন্য কেউ করতে পারেন, বরং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যার দুর্ভাগ্যবশত অনেকগুলি তাৎপর্য রয়েছে।'

রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫১ সালের ১০ মার্চ নেহরুকে লিখেছিলেন যে সোমনাথ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে নির্মিত হচ্ছিল এবং তিনি যদি এই অনুষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন তবে তিনি

অস্বাভাবিক কিছু করছেন না, কারণ তিনি ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যান্য উপাসনালয় পরিদর্শন করেন। তাছাড়া, তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা ঠিক মনে করেননি কারণ সোমনাথ মন্দিরের অনেক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং আমন্ত্রণটি (সৌরাষ্ট্র)রাজ্যের রাজপ্রমুখের কাছ থেকে এসেছিল, যিনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলেন।

এরপর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রত্যুত্তর থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মতপার্থক্যগুলো কীভাবে অত্যন্ত সৌজন্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে মোকাবেলা করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ১৩ মার্চ তার উত্তরে নেহরু বলেন– 'সোমনাথ মন্দিরে আপনার ভ্রমণের বিষয়ে ১০ মার্চের আপনার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি। তবে যদি আপনার মনে হয় যে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা আপনার পক্ষে ঠিক হবে না, তাহলে আমি আমার বক্তব্য আর জোর দিয়ে বলতে চাই না।'

এক মাসেরও বেশি সময় পরে, যখন সোমনাথ ইস্যুটি যথেষ্ট বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন পন্ডিত নেহরু আবারও ব্যাখ্যা করেন যে তাঁর আপত্তি মন্দিরের সাথে সরকারের যোগসূত্র নিয়ে। ১৯৫১ সালের ২২শে এপ্রিল তিনি লিখেছিলেন— 'আমার প্রিয় রাজেন্দ্র বাবু, আমি সোমনাথ ঘটনা নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমার আশঙ্কা ছিল, এটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিকভাবেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিষয়ে আমাদের নীতির সমালোচনা করে, আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আমাদের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কীভাবে এমন একটি অনুষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। সংসদে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং আমি তাঁদের উত্তর দিচ্ছি যে সরকারের এর সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এবং যাঁরা কোনওভাবে এর সাথে যুক্ত তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে (ইচ্ছায়) এই কাজ করেছেন।''সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, সৌরাষ্ট্র সরকার এই সোমনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আমার কাছে মনে হয় যে কোনও সরকারের পক্ষে এটি করা সম্পূর্ণ অনুচিত এবং আমি সেই অনুযায়ী সেই সরকারকে চিঠি লিখেছি। যেকোনো সময়, এটি অবাঞ্ছিত হত, কিন্তু বর্তমান সময়ে, যখন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং আমাদের দ্বারা সকল ধরণের জাতীয় অর্থনীতির (ব্যয়) ক্ষেত্রে মিতব্যয়ীতার এবং কঠোরতার কথা প্রচার করা হচ্ছে, তখন সরকারের এই ব্যয় আমাকে প্রায় হতবাক করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর স্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও রাজেন্দ্র প্রসাদ সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ ও নেহেরু-জীবনীকার সর্বপল্লী গোপালের মতে, রাজেন্দ্র প্রসাদ 'মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ'। তবে, মোদী নেতৃত্বে তাঁর দল, জওহরলাল নেহেরুর প্রতিস্পর্ধী হিসেবে এই উপলক্ষে যে রাজেন্দ্র প্রসাদকে উপস্থাপিত করতে চায় (যেমন বহু ক্ষেত্রে বল্লভ ভাই প্যাটেলকে করা হয়), সেটাও এই দুষ্প্রচারের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, নেহরুর কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সব ধর্মের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখা; আর প্রসাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সব ধর্মের সঙ্গে নিজেকে সমানভাবে সংযুক্ত রাখা। সোমনাথ মন্দিরের তাঁর ভাষণেও প্রসাদ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা। তিনি বলেছিলেন, মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কিন্তু পুরনো ক্ষতকে খুঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়। প্রসাদ ঘৃণার রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না।

আধুনিক ভারতের মন্দির শব্দটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরু ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু করার সময় ব্যবহার করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইস্পাত কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ ইত্যাদি স্বাধীনতার পর ভারতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প অগ্রগতির সূচনা করার জন্য নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি এই গুলিকে আধুনিক ভারতের মন্দির হিসেবে বর্ণনা করেন।

আন্তর্জাতিক

ট্রাম্পের 'ডিসকম্বোবুলেটর' রহস্য: মাদুরো গ্রেপ্তারে গোপন অস্ত্রের আন্তর্জাতিক ঝড়

সুকুমার মিত্র

৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন অ্যাবসলিউট রিজলভ' আধুনিক সামরিক ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব এবং অত্যন্ত বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই অভিযানের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা লাতিন আমেরিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নারকো-টেররিজম এবং অস্ত্র পাচারের অভিযোগে মাদুরোকে নিউ ইয়র্কের কারাগারে বন্দি করার এই ঘটনাটি শুধু একটি দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং সামরিক প্রযুক্তির বিবর্তনের এক নতুন সংকেত প্রদান করে।

অভিযানের কৌশলগত দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি ছিল গোয়েন্দা তথ্য এবং উচ্চপ্রযুক্তির এক নিপুণ সমন্বয়। মাসের পর মাস ধরে রুশ ও চিনা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করার পর অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সাইবার হামলা এবং ড্রোনের মাধ্যমে ভেনেজুয়েলার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে দেওয়া হয়। মাত্র ৪৫ মিনিটের এই অভিযানে কোনো মার্কিন সেনার হতাহত না হওয়া সামরিক সক্ষমতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এই অভিযানের ঠিক পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে 'ডিসকম্বোবুলেটর' নামক একটি রহস্যময় অস্ত্রের কথা প্রকাশ্যে আনা হয়, যা আন্তর্জাতিক সামরিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। যদিও এই অস্ত্রের সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয়েছে, তবুও বিশেষজ্ঞদের ধারণা এটি কোনো উন্নত পালস এনার্জি বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অস্ত্র হতে পারে যা শত্রুপক্ষের ইলেকট্রনিক সরঞ্জামকে নিমিষেই অকেজো করে দেয়। কেউ কেউ একে সোনিক বা অ্যাকোস্টিক অস্ত্র হিসেবেও চিহ্নিত করছেন, কারণ মাদুরোর নিরাপত্তারক্ষীরা তীব্র শব্দ এবং অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন যা অনেকটা 'হ্যাভানা সিন্ড্রোমের' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই অস্ত্রের অস্তিত্ব বা কার্যকরিতা নিয়ে রাশিয়া ও চিন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং একে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন ও নতুন এক বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা হিসেবে বর্ণনা করেছে। রাশিয়ার মতে, কারাকাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকেজো হওয়া কোনো জাদুকরী অস্ত্রের ফল নয়, বরং উন্নত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার কৌশলের প্রয়োগ মাত্র।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই অভিযানের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং বিভক্ত। একদিকে কলম্বিয়া ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলো একে মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জয় হিসেবে দেখলেও কিউবা, নিকারাগুয়া এবং মেক্সিকোর মতো দেশগুলো একে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারত এই স্পর্শকাতর বিষয়ে তার সতর্ক নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পের সাথে আলোচনা করলেও কোনো পক্ষ না নিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছেন, যা ভারতের বহুপাক্ষিক কূটনীতি এবং শক্তি ভারসাম্যের কৌশলেরই প্রতিফলন। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক ধারণা এবং সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া অন্য একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আটক করা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য উদ্বেগের কারণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, অপারেশন অ্যাবসলিউট রিজলভ এবং রহস্যময় 'ডিসকম্বোবুলেটর' অস্ত্র একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের পরিবর্তিত রূপকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। ভেনেজুয়েলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এখন গভীর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে;ক্ষমতার রূপান্তর, অর্থনৈতিক সংকট এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে বিভক্তি দেশকে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। এই অভিযান প্রমাণ করেছে যে, আধুনিক যুদ্ধ এখন আর কেবল সীমান্তের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা সাইবার স্পেস এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের এক অদৃশ্য সমরে পরিণত হয়েছে। 'ডিসকম্বোবুলেটর' যদি সত্যিই কোনো নতুন প্রযুক্তির অস্ত্র হয়ে থাকে, তবে তা সামরিক কৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। আর যদি এটি কেবল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অংশ হয়, তবে তা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কৌশলগত বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষমতার এক চরম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। যাই হোক না কেন, এই ঘটনাটি আগামী বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিতর্ককে প্রভাবিত করতে থাকবে।

সূত্র- CNN– NY Post– BBC

বাংলাদেশ আজ মৃত্যু উপত্যকা', পুতুল শাসন উৎখাতের আহ্বান হাসিনার

সুকুমার মিত্র

বাংলাদেশের নির্বাসিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারি মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি দেশে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য 'বিদেশী-দাস পুতুল শাসন' উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছেন।

নতুন দিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়ায় প্রচারিত এক অডিও বার্তায় বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনকে বাংলাদেশকে সন্ত্রাস, আইনহীনতা এবং গণতান্ত্রিক নির্বাসনের যুগে ঠেলে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইউনূসের শাসনকে

'বিদেশি-সেবাকারী পুতুল শাসন' বলে অভিহিত করে ইউনুসের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান । হাসিনা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য জনগণকে একজোট হবার আবেদন জানান।

হাসিনা তাঁর অডিও ভাষণে আহ্বান জানিয়েছেন, 'এই কঠিন সময়ে, সমগ্র জাতিকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে জেগে উঠতে হবে। যে কোনও মূল্যে এই জাতীয় শত্রুর বিদেশি-দাস পুতুল শাসনকে উৎখাত করতে, বাংলাদেশের সাহসী পুত্র-কন্যাদের শহিদদের রক্তে লেখা সংবিধান রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করতে হবে, আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হবে, আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করতে হবে'।

তাঁর ভাষণের সুর ঠিক করে শেখ হাসিনা বর্তমান বাংলাদেশের এক ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন, প্রায় দেড় বছর আগে গণবিক্ষোভের পর তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতার যোগসূত্র টেনেছেন। 'বাংলাদেশ আজ এক অতল গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, একটি জাতি যা বিধ্বস্ত ও রক্তক্ষয়ী, তাঁর ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায়গুলির একটি অতিক্রম করছে' তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করে বলেন, 'পুরো দেশ একটি বিশাল কারাগার, একটি ফাঁসির ক্ষেত্র, একটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে।'

হাসিনা আরও অভিযোগ করেন যে, ৫ আগস্ট, ২০২৪ সাল থেকে, যখন তাঁকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, গণতন্ত্র কার্যকরভাবে নির্বাসনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টাকে সরাসরি লক্ষ্য করে তিনি বলেন, তসর্বত্রই কেবল ধ্বংসের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জীবনের জন্য এক মরিয়া আবেদন। ত্রাণের জন্য হৃদয়বিদারক আর্তনাদ। খুনি ফ্যাসিস্ট ইউনূস, একজন সুদখোর, একজন অর্থ পাচারকারী, একজন লুণ্ঠনকারী এবং একজন দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক, তাঁর সর্বগ্রাসী দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের জাতিকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, আমাদের মাতৃভূমির আত্মাকে কলঙ্কিত করেছে।দ ত৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে, একটি সুনির্দিষ্ট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, জাতীয় শত্রু, খুনি ফ্যাসিস্ট ইউনূস এবং তার রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গি সহযোগীরা আমাকে জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করে, যদিও আমি সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। সেই দিন থেকে, জাতি সন্ত্রাসের যুগে নিমজ্জিত হয়েছে, নির্দয়, নির্মম এবং শ্বাসরোধকারী। গণতন্ত্র এখন নির্বাসনে,দ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন।

অডিও ভাষণে শেখ হাসিনার পাঁচ দফা দাবি

শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর আওয়ামী লীগ জাতীয় পুনর্মিলন এবং গণতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি পেশ করছে। এর মধ্যে রয়েছে 'অবৈধ ইউনূস প্রশাসনের অপসারণ', রাস্তায় হিংস্রতার অবসান, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী এবং দুর্বল গোষ্ঠীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সাংবাদিক এবং বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি তদন্ত বন্ধ করা এবং গত এক বছরের ঘটনাবলীর বিষয়ে জাতিসংঘের নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।

বঙ্গবন্ধু তনয়া হাসিনা আরও বলেন, 'আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং গত কয়েক মাসের বিভেদমূলক কর্মকাণ্ড দূর করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা মুহাম্মদ ইউনূসকে তাঁর নিজের জনগণকে উপেক্ষা করা বন্ধ করার এবং আমাদের দেশকে সুস্থ করার জন্য যা করা দরকার তা করার জন্য অনুরোধ করছি, পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অনুসরণ করে যা আমরা বিশ্বাস করি একটি উন্নত ও শক্তিশালী বাংলাদেশ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে'।

প্রথমত, অবৈধ ইউনূস প্রশাসনকে অপসারণ করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করুন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের রাস্তায় প্রতিদিন যে হিংসা দেখা যাচ্ছে তা বন্ধ করুন।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, নারী ও মেয়েদের এবং আমাদের সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি দৃঢ় গ্যারান্টি প্রদান করা।

চতুর্থত, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাংবাদিকদের, সদস্যদের ভয় দেখানো, কণ্ঠ রোধ করা এবং কারাগারে পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি কার্যকলাপ বন্ধ করুন।

পঞ্চমত, গত বছরের ঘটনাবলীর একটি নতুন এবং সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার জন্য জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ জানান।

ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে ২০২৪ সালের আগস্টে হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এরপর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তদারকি সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলাদেশেও এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ইউনূস প্রশাসন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিলেও, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে হাসিনা কঠোর

ভাষায় সমালোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঐতিহাসিকভাবে দেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটে রয়েছে। হাসিনার পাঁচ দফা দাবি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে ইউনূস প্রশাসন নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করছে। আসন্ন নির্বাচনই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক কাঠামো কোন পথে যাবে;অন্তর্ভুক্তিমূলক পুনরুজ্জীবন নাকি আরও বিভাজন ও ভয়াবহ অস্থিরতা।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জামায়েত ই ইসলামীর বক্তব্য

সংবাদ এজেন্সি আল জাজিরা জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। প্রশ্ন উত্তর দেখে নিন!! আপনারা জিতলে কি বাংলাদেশে ইসলামিক আইন জারি হবে? - ভবিষ্যতে মানুষ যা ভাল মনে করে তাই করবে। ওটা মানুষের ব্যাপার।

কিন্তু অন্যরাতো, মানে আপনার দলের নেতারাতো বিভিন্ন জায়গায় এসব বলছে?

—আপনি শুধু পার্টির প্রধানের কথা শুনুন। অন্যরা কি বলছে সেটা ব্যাপার না। পার্টির প্রধান কি বলে ওটাই আসল। ওতে যদি দেশের উপকারে আসে, তাহলে সংসদ সেটা ঠিক করবে।

আপনি বলেছেন যে, আপনি নারীদেরকে সম্মান করেন। তাহলে একটু বলুন যে, আপনারা এবারের ইলেকশনে কয়জন নারীকে নমিনেশন দিয়েছেন?

একজনও না। কিন্তু আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি এবং তারা জিতেছেও। মানে এই নির্বাচনে আপনারা একজন নারীকেও নমিনেশন দেননি?

—না একজনও না। অন্য দলও যে খুব বেশি দিয়েছে সেটা আপনি দেখাতে পারবেন না। কারণ এটা বাংলাদেশের কালচার। আমরা এরজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কিন্তু তারাতো অল্প কিছু হলেও দিয়েছে। আপনাদের মত শূণ্য না। আপনারা একজনকেও দিলেন না কেনো?

— আমি অলরেডি উত্তর দিয়েছি। আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি! এটাতো একদিনে হয়ে যাবে না! আমরা এ বিষয়ে নারীকে অসম্মান করিনা।

যদি কখনো কোনো নারী চায় যে সে জামাতের প্রধান হবে, আপনার পদে বসবে, সেটা কি সম্ভব?

—না। এটা সম্ভব না। করণ আল্লাহ প্রত্যেককে আলাদাভাবে বানিয়েছে। আমরা পুরুষরা কখনোই বাচ্চা পালতে পারবেনা। আমরা বাচ্চাদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবোনা। এটা আল্লাহর দান। যেটা আল্লাহ বানাইছে ওটা আমরা পাল্টাতে পারবোনা।

আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা। নারী যদি পরিবার চালাতে পারে, সে যদি বাচ্চা পালতে পারে, তাহলে জামাতের প্রধান হতে পারবেনা কেনো?

— এমন কিছু জিনিস আছে যেখানে তারা দায়িত্ব পালন করতে পারবেনা। তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। আপনি জানেন সেটা।

না আমি আসলে জানিনা...

— কেনো জানেন না সেটা আপনি? মা বাচ্চা পয়দা করার পর যে দায়িত্ব পালন করে সেটা কি আপনি পারবেন? নেভার। আল্লাহ সব ভাল জানেন।

কিন্তু গত তিন দশকতো দেশে নারী প্রধানমন্ত্রী ছিল। তারা কি দেশ চালায়নি?

—আমরা তাদেরকে অসম্মান করছিনা। আমাদের তাতে অসুবিধা নাই।

মেয়েরা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে না? তারা কত প্রতিষ্ঠানের প্রধান না? তাহলে দেশ চালাতে পারবেনা কেনো?

—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ নারীদেরকে এ পদে যোগ্য মনে করেনা।শারীরিকভাবেই এটা সম্ভব না। এটাই সত্য।

নানা দেশের প্রধানইতো নারী!!

—-অল্প কয়েকটা দেশে।

মজারতো! আপনি বিএনপির পার্ট ছিলেন আগে, যেখানে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী ছিল। আপনি কি মনে করেন না যে উনি ভাল কাজ করেছে?

—ইয়েস। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত না। ওটা ওদের পার্টির সিদ্ধান্ত।

পরিবেশ

জলাভূমি ধ্বংস : এক অশনি সংকেত

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ও রাহুল রায়

অতি সম্প্রতি আনন্দপুর-এ জতুগৃহ কাণ্ডের পর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ প্রশাসনের কাজকর্মে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তোপ দেগেছেন। প্রশাসনিক অস্বচ্ছতার কারণে রাজ্যজুড়ে জলাভূমি বেআইনিভাবে বোজানো হচ্ছে বলে ক্ষোভ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, এসব অপকর্ম চলবে না। অপকর্মে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে আইনমাফিক, তা সে যত বড় মাতব্বরই হোক না কেন। এমনকি তাঁর দলের কেউ জড়িত থাকলে তাদেরও। মুখ্যমন্ত্রীর এই ক্ষোভ সুনাগরিকদের কাছে অত্যন্ত স্বস্তির ও সাধুবাদযোগ্য। এই প্রশাসনিক শুদ্ধিকরণের প্রচেষ্টার মধ্যেই কলকাতা তথা রাজ্যের নানান অঞ্চলে জলাভূমি বোজানো কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। রাজনৈতিক মদত এবং প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা ছাড়া জলাভূমি বোজানো কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণ

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গড়ার জন্য এক অনাবাসীকে রাজ্য সরকার ২২৭ একর জমি বরাদ্দ করে। এর প্রতিবাদে ১৯৯২ সালে পাবলিক নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কলকাতা উচ্চ আদালতে এক জনস্বার্থ মামলা করলে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় বিচারপতি শ্রী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় দিয়েছিলেন, জলাভূমি যত ছোটই হোক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তার গুরুত্ব অসীম। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির চরিত্র যাতে বদলে না ফেলা হয়, তার জন্য রাজ্য সরকারকে তিনি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের আদেশ দেন। এর পর ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪, কলকাতা উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারকদ্বয় শ্রী ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অশোক চক্রবর্তী তাঁদের আদেশে বলেন, জলাশয় ছোট হলেও তাকে কখনোই ভরাট করা চলবে না। রাজ্য সরকার এসব আদেশ মেনে ঘোষণা করলেন কোনও জলাভূমি বোজানোর চেষ্টা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০০২ সালের ১৯ অগাস্ট পূর্ব কলকাতা জলাভূমি আন্তর্জাতিক রামসার কনভেনশন অনুযায়ী রামসার অঞ্চল (রামসার সংখ্যা ১২০৮) হিশেবে স্বীকৃত হয়। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩১ মার্চ ২০০৬ তারিখে এই জলাভূমির পরিচালন ও সংরক্ষণের জন্য ইকেডাব্লিউএমএ গঠন করে 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালন) আইন' চালু করেন।

জলাভূমির যে পরিষেবা কলকাতা পায়

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি পৃথিবীতে নাগরিক বর্জ্যের বৃহত্তম প্রাকৃতিক অনাময় (রিকভারি) ব্যবস্থা। এই জলাভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হওয়ায় সমস্ত নাগরিক বর্জ্য এবং বৃষ্টির জল এসে (বা কখনো পাম্প করে) এই জলায় পড়ে। এই জলাভূমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বেশ কিছু অগভীর পুকুর, যেখানে জলাভূমিতে বসবাসকারী গ্রামবাসীরা মাছ চাষ করে। এসব জলাভূমিতে সূর্যের আলোয় প্রাকৃতিকভাবে মহানগরীর বর্জ্যের শোধন চলে একেবারে বিনি পয়সায়, টাকার অংকে বছরে যার মূল্য প্রায় ৪৬৮ কোটি টাকা। জলাভূমির প্লাঙ্কটন মাছের প্রধান খাদ্য। মহানগর থেকে রোজ প্রায় ১০০০ লিটার বর্জ্য জল এই জলায় মিশে প্রাকৃতিকভাবে মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। মহানগরবাসী বছরে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন টন মাছ খাদ্য হিসেবে পায়। রাজ্য সরকারের হিসেবে বর্ষার নিকাশি জলে এবং মাছের ভেড়ির বর্জ্য জলে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে বছরে প্রায় ৫০,০০০ মিলিয়ন টন শাকসবজি উৎপন্ন হয়। হতদরিদ্র হাজার পঞ্চাশেক মানুষ এসব মাছ, শাকসবজি ও ফুল চাষ করে মহানগরীর নানান বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কার্বন সিঙ্ক রূপে মহানগরীর বায়ু দূষণ কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই জলাভূমি বর্জ্য জলের প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কার্বন স্বতন্ত্র রাখতে (সিকোয়েস্ট্রেশন) পারে। এতে বাতাসে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস মেশা কমে। পশ্চিমে হুগলি নদীতীর এবং পূর্বে অবস্থিত কুলটি গাঙ-এর মধ্যবর্তী নিচু জায়গা মহানগরের জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই প্রাকৃতিক বাফারটি ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও শহরকে রক্ষা করে।

বিপন্ন জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য

রাজ্য সরকারি সংস্থা 'ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস্ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি'-এর (ইকেডাব্লিউএমএ) তথ্য অনুযায়ী ২২০২৫′-২২°৩৫′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°২০′-৮৮°৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি অবস্থিত। এর আয়তন ১২,৫০০ হেক্টর।১৯৯১-২০২১ সালে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির সামগ্রিক আয়তন ৩৫-৪০ শতাংশ কমেছে। রিমোট সেন্সিং মারফত প্রাপ্ত তথ্য এবং ক্ষেত্র-সমীক্ষায় ধরা পড়েছে মূলত তিনটি কারণ পূর্ব কলকাতা

জলাভূমির আয়তন হ্রাসের জন্য দায়ী। এগুলি হল- রিয়েল এস্টেট প্রোমোটার/ডেভেলপারদের জলাভূমি দখল, ইউট্রোফিকেশন (জলাশয়ে শ্যাওলা ও প্লাঙ্কটন-এর অত্যধিক বৃদ্ধি) এবং জলা অঞ্চলকে মাছের ভেড়িতে পরিণত করা। ইকেডাব্লিউএমএ-এর প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি, ২০২১) 'ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অফ ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস, ২০২১-২৬' থেকে জানা যাচ্ছে, ২০০০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে জলাভূমির চরিত্র সবচেয়ে বেশি বদলে ফেলা হয়েছিল। ১৭০০ হেক্টর জলাভূমি বরাদ্দ হয়েছিল মাছের ভেড়ি গড়তে। জলা অঞ্চলে বাসস্থান গড়তে বরাদ্দ পরিমাণ ছিল ১০০০ হেক্টর। আর কঠিন বর্জ্য ডাঁই করে রাখার জায়গাটিও দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৯০ হেক্টর করা হয়।

ওই একই প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, ১৯৬৪-১৯৬৯ সালে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র পাখির প্রথম ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এই অঞ্চলে প্রায় ২৪৮টি প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিগত ৩০ বছরে তা কমে গিয়ে কমবেশি ১৬২টি প্রজাতিতে দাঁড়িয়েছে। শিকারি পাখি সহ বেশ কিছু বড় আকারের পাখি, যেগুলি সাম্প্রতিক অতীতেও ছিল, সেগুলোকে এখন আর দেখা যায় না।

প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা

পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমি বাঁচানোর জন্য কেবল 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালন) আইন, ২০০৬' ছাড়াও বেশ কয়েকটি আইন রয়েছে, যেমন- 'জল দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৪', 'পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬', 'জীববৈচিত্র্য আইন, ২০০২' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ জলাভূমি এবং জলাশয় সংরক্ষণ আইন, ২০১২'। এতগুলি আইনি রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ থেকে অননুমোদিত বাণিজ্যিক কাজকর্ম (যেমন, বর্তমানে একটি রেডি-মিক্স প্লান্ট চলছে) সব কিছুই প্রশাসনের নাকের ডগায় খুল্লামখুল্লা চলছে। ইকেডাব্লিউএমএ-এর ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে গত ১৫ বছরে এই জাতীয় অবৈধ কাজকর্মের বিরুদ্ধে ৩৫৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সম্প্রতি তথ্যের অধিকার আইনে জানতে চাওয়া এক নাগরিকের চিঠির উত্তরে রাজ্য পরিবেশ দপ্তর জানিয়েছে, ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত জলাভূমি সংক্রান্ত আইন ভাঙায় ৪৯৩টি ফৌজদারি মামলা নানান থানায় দায়ের হয়েছে। ইকেডাব্লিউএমএ-এর ওয়েবসাইট থেকে হাতে গোনা মাত্র দুইটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার আদেশের কথা জানা যাচ্ছে। বস্তুত গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়েই জলাভূমি ও জলাশয় বোজানো চলে আসছে। কখনোই যথাযথ সংরক্ষণ বা সংস্কার করা হয় না। জলাভূমি বা জলাশয়ের চরিত্র বদলে যাচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য নির্দিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে।

নিষ্ক্রিয়তার কারণ কী

তিনটি কারণ এই প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার পেছনে রয়েছে বলে মনে করা হয় – রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, কম মাত্রায় গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং বাজারি শক্তির দাপট। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবটি ২০২৪-২৫ সালের রাজ্য বাজেটের দিকে তাকালেই বেশ বোঝা যায়, যখন পরিবেশ দপ্তরের জন্য বরাদ্দ হয় মোট বাজেটের মাত্র ০.০০০৩ শতাংশ অর্থ। এত কম বরাদ্দে কোন পরিচালন সংস্থা কীভাবে নাগাড়ে নজরদারি করে জলাভূমি দখল রুখবে, তা বোধগম্য নয়। আজও পূর্ব কলকাতা জলাভূমির সীমানা পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি। জলাভূমি-শিকারিদের কাছে এটি পৌষ মাস হয়ে দেখা দিচ্ছে। সরকার বা প্রশাসন থেকে স্থানীয় গোষ্ঠীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে খুব একটা তৎপরতাও নজরে আসে না।

অতঃকিম্

জলাভূমি এক অত্যন্ত উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্র। জলাভূমির অন্যতম প্রধান কাজ বর্জ্য জলে মিশে থাকা ভারী ধাতু ও অন্যান্য বিষাক্ত উপাদানগুলিকে সূর্যের আলোর সাহায্যে নষ্ট করে সেই জলকে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। জলাভূমি নানান সরীসৃপ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও জল-নির্ভর পাখিদের আবাসস্থল। এক বর্গমিটার পরিমাণ জলাভূমি জলজ প্রাণীদের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রতি মিনিটে ২৪ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করে। উল্লেখ্য, একজন মানুষের বাঁচার জন্য প্রতি মিনিটে অক্সিজেনের প্রয়োজন ২.১ গ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জলাভূমি রক্ষার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কলকাতা উচ্চ আদালত ২০০৫ সালের আদেশনামায় একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে বলেন। কিন্তু সেরকম কোনও পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সাধারণ মানুষের জানা নেই। দেশের মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে জলাভূমি রক্ষা একটি গুরুদায়িত্ব। মহানগরীর সমস্ত রকম অশোধিত তরল বর্জ্যকে কলকাতার বৃক্ক স্বরূপ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নীলকণ্ঠ হয়ে ধারণ ও শোধন করে। একটি মানুষের বৃক্ক চলে গেলে তার পরিণতি সম্ভবত কারোর অজানা নয়। পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি ক্রমান্বয়ে হত্যা মানেই তিল তিল করে তিলোত্তমার মৃত্যুকেই আহ্বান করা।

স্মরণ

মার্ক টুলি

(১৯৩৫–২০২৬)

গত ২৫ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন মার্ক টুলি, যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের নৃশংসতা নিয়ে সারা বিশ্বকে অবহিত করেন। পশ্চিমা বিশ্বের দ্বিচারিতা এবং পাকিস্তানের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সামনে সত্য তুলে ধরেন তিনি। এই সত্য তুলে ধরার সাহস ও শক্তি এক দিনে আসেনি। মার্ক টুলির জীবনই ছিল সত্যের জন্য ত্যাগের ইতিহাসে লিখিত। একজন সত্যনিষ্ঠ ও একই সঙ্গে দক্ষ সাংবাদিক ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন টুলি। তাঁর পিতা ব্রিটিশ রাজের নিয়ন্ত্রণাধীন শীর্ষস্থানীয় অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশবের প্রথম দশকে তিনি ভারতে অবস্থান করেন। কিন্তু ভারতীয়দের সাথে সামাজিকভাবে মেলামেশার সুযোগ পেতেন না তিনি। তিনি ইংল্যান্ডের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। টাইফোর্ড স্কুল, মার্লবোরো কলেজ এবং ট্রিনিটি হলে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি। এরপর তিনি ক্যাম্ব্রিজের চার্চ অব ইংল্যান্ডে পাদ্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লিঙ্কন থিওলোজিক্যাল কলেজে দুই মেয়াদে পড়াশোনার পর এ চিন্তাধারা স্থগিত করেন। এখানে ভর্তি হয়ে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন; বিশেষ করে তিনি তাদের যৌনজীবনের সংযমতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। সততার কারণে তিনি পাদ্রী হবার স্বপ্ন পরিত্যাগ করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি বিবিসিতে যোগদান করেন। ভারতীয় সংবাদদাতা হিসেবে ১৯৬৫ সালে ভারতে চলে আসেন। দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থানকালীন তার কর্মজীবনে তিনি অনেকগুলো প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছেন। তন্মধ্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, অপারেশন ব্লু স্টার ও এর ফলশ্রুতিতে সংঘটিত ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ড, শিখবিরোধী দাঙ্গা, রাজীব গান্ধী হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়মিতভাবে বিবিসিতে প্রেরণ করতেন।

জুলাই, ১৯৯৪ সালে মার্ক টুলি বিবিসি থেকে পদত্যাগ করেন। জন বার্ট নামীয় সহকর্মীর (পরবর্তীতে মহাপরিচালক) সাথে বাদানুবাদ করাই এর মূল কারণ। তিনি বার্টকে 'ভীত হয়ে প্রতিষ্ঠান চালানো' এবং 'বিবিসির নিম্নমুখীতা ও সহকর্মীদেরকে নৈতিকভাবে দুর্বল করা'র দায়ে অভিযুক্ত করেন। এরপর থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা ও নতুন দিল্লিতে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন।

মার্ক টুলি ১৯৮৫ সালে ওবিই পদবীতে ভূষিত হন। ১৯৯২ সালে পদ্মশ্রী পদক লাভ করেন। ২০০২ সালে নতুন বছরের সম্মাননাস্বরূপ নাইট উপাধি লাভ করেন। ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ পদক লাভ করেন। ভারতে অবস্থান করে তিনি ১৯৮৫ সালে তার প্রথম গ্রন্থ ' অমৃতসর ঃ মিসেস গান্ধী'জ লাস্ট ব্যাটেল ' প্রকাশ করেন। এতে তিনি তার সহকর্মী ও বিবিসি দিল্লি'র প্রতিনিধি সতীশ জ্যাকবকে নিয়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁরা বইটিতে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সংঘটিত অপারেশন ব্লু স্টারের ঘটনাবলী, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক শিখ বিদ্রোহীদের দমন ইত্যাদি বিষয়ের খুঁটিনাটি তুলে ধরেন। এছাড়াও, ১৯৯২ সালে টুলির অন্যতম সেরা পুস্তক ' নো ফুল স্টপস ইন ইন্ডিয়া ' প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকার জন্য টুলিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ২০১২ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়।.বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা ও অত্যাচারিত মানুষের বেদনা সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মার্ক টুলি তার উত্তরে বলেছিলেন, ' আমি আপনাদের হয়ে কিছু করিনি। সাংবাদিক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।'

ওপারে ভাল থাকবেন স্যার উইলিয়াম মার্ক টুলি। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ (পাকিস্তান ও জামাত বিএনপিপন্থী অমানুষেরা নয়) আপনার আত্মার শান্তি কামনা করবে যেহেতু আপনি ন্যায় ও সত্যকে তুলে ধরেছেন সারা জীবন নানা ঝুঁকি ও ক্ষতি স্বীকার করে।

ধারাবাহিক

জরুরি অবস্থা ও সি.পি.আই পার্টির স্বাধীন রণনীতি বিসর্জন

সুশান্ত দাশগুপ্ত

মোহিত সেন তাঁর 'এ ট্রাভেলার অ্যান্ড দি রোড, জার্নি অফ এন ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট ' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফল যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি বোম্বাইতে ছিলেন। দাদারে এস এ ডাঙ্গের বাসায় তাঁর সঙ্গে মোহিত সাক্ষাৎ করেন। কম. ডাঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির প্রত্যাবর্তন ও বিপুল জয় এবং সিপিআই-এর চূড়ান্ত বিপর্যয়ের খবর শোনেন। তিনি সাধারণভাবে যেমন থাকেন তেমনই শান্ত ও নির্বিকার ছিলেন। তিনি বলেন পার্টির পক্ষে এরকম

একটি ভূকম্পনও রাজেশ্বর রাওয়ের পার্টির ওপর যে নিয়ন্ত্রণ তাকে শিথিল করবে না। এর পরে তিনি একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলেন, পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার জন্য সমগ্র পার্টি সম্পাদকমণ্ডলীর একযোগে পদত্যাগ করা উচিত। তিনি মোহিত সেনকে একথাও বলেন যে এঁদের চামড়া এতটাই পুরু যে এঁরা কখনই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন না।

তার পরের ঘটনা ঘটল পার্টির জাতীয় পরিষদের দিল্লি অধিবেশনে। ষোলো জন বাদে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পার্টির নির্বাচনী নীতিকে শুধুমাত্র অনুমোদন করল তাই নয় তাঁরা পার্টির চেয়ারম্যান পদ থেকে কম. ডাঙ্গেকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তাব করে। এই অধিবেশনে মোহিত সেন লিখেছেন, কম. ডাঙ্গে একটি দীর্ঘ এবং অসাধারণ উদ্দীপক বক্তৃতা দেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক মত ও অবস্থানের সপক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করতে গিয়ে 'জাতি' ও 'শ্রমিক শ্রেণির' স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য কমিউনিস্টদের কী করা উচিত সেসম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। দেশ ও বিশ্বে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করেন।

ডাঙ্গের বাগ্মীতা ও ক্ষুরধার বিশ্লেষণকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না বলেই রাজেশ্বর রাও কম ডাঙ্গের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বক্তৃতার কোনও জবাব দেননি, চেষ্টাও করেননি। তিনি বলেন এবং জোর দেন পার্টির সংগঠনে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়কতার ' ওপর। তিনি বলেন , এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়কতার নীতি অনুযায়ী কম ডাঙ্গের প্রকাশ্যে পার্টি লাইন সমর্থন করে বিবৃতি দেওয়া উচিত, এমনকী যদি তিনি মনে করেন যে পার্টি লাইন ভুল।

মোহিত সেনের মতে, একদা ট্রটস্কি বলেছিলেন' তুমি পার্টির বিরুদ্ধে হলে কখনই সঠিক মত পোষণ করতে পারো না । ট্রটস্কির এই বক্তব্যকে সম্বল করেই স্টালিন 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়কতার' তথাকথিত নীতি রচনা করেন। এইভাবে লেনিনের একটি প্রাণবন্ত ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির উত্তরাধিকারকে স্টালিন ধ্বংস করেছিলেন। রাজেশ্বর রাও শুধু ডাঙ্গেকে এই তথাকথিত নীতি প্রয়োগ করে পরাস্ত করেননি , তিনি একই সঙ্গে সিপিআই-এর অভ্যন্তরীণ জীবনের যে ছন্দ তাকেও ধ্বংস করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের এই মতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাঙ্গে যে ভুলগুলি চিহ্নিত করেছিলেন তাতে তিনি অবিচল থাকলেন এবং তিনি ভুল বিশ্লেষণ করছেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারপর যা হয়েছিল তা সমগ্র সিপিআই দলের ওই কার্যকরী নেতৃত্বকে হতচকিত করে দেয়। কম ডাঙ্গে তাঁর কালো পোর্টিফোলিও ব্যাগটি হাতে নিলেন যাতে তাঁর কাগজপত্র ছিল এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কক্ষ থেকে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। ওই সময়ে, মোহিত সেন লিখেছেন, সভাকক্ষে অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে। সভার সাময়িক বিরতি ঘোষণা করা হয়। সদস্যরা সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছিলেন না। স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্বেতশুভ্রকেশ এই বৃদ্ধের স্মৃতি যিনি ১৯১৯ সাল থেকে এই দেশে মার্কসবাদ চর্চার পথিকৃৎ, যিনি ১৯২৫ সালে পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং দেশের স্বার্থ ও শ্রেণিস্বার্থের সবসময় মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তা কখনই ম্লান হবার নয়। ১৯২৪-এ কানপুর ও পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশন বয়কট ও বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট, ১৯২৯-এর মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহের সমর্থনের বোম্বের শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ধর্মঘট, ১৯৬২তে চিনের হটকারি নেতৃত্বের ভারত আক্রমণ প্রভৃতি প্রতিটি ঘটনায় তিনি সর্বদাই জাতীয় স্বার্থ ও শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন ।

যদিও কম ডাঙ্গে , মোহিত সেন লিখেছেন . কম ডাঙ্গে তাঁকে (মোহিত কে) বলেছিলেন কোনও নতুন দ্বখন্ঠা গঠন করার অভিপ্রায় তাঁর নেই। তবে তিনি ১৯৮১ এর মার্চ মাসে মিরাট শহরে নবগঠিত

অল ইন্ডিয়া মিউনিস্ট পার্টির (AICP) অধিবেশনে যান। সেখানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'সিপিআই-এর আর কোনও ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই ও এই দল ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। (চলবে)

আপনজনের কথা

কটুকাকা'র কথা আজও মনে পড়ে

চন্দ্রপ্রকাশ সরকার

গ্রামের দিকে নামের বিকৃতি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের গ্রামে আমার অনুজপ্রতিম এক শ্রীদাম মন্ডল আছে। সবাই তাকে অবলীলায় 'ছিদাম' নামে ডাকে। বড় এবং সমবয়সীরা ছিদামকে আরো ভেঙেচুরে 'ছিদমা' করে নিয়েছে! বিকৃতস্য বিকৃতি! গ্রামে ছিলেন দু'জন পঞ্চানন। আমৃত্যু তারা বন্ধুমহলে পঞ্চা এবং অন্যদের কাছে পঞ্চু নামে পরিচিত ছিলেন। এই দুই পঞ্চুকে নির্দিষ্টভাবে বোঝানোর

জন্য একজনকে কালো পঞ্চু এবং অপরজনকে কটা পঞ্চু বলা হত। গায়ের রং যার কালো তিনি কালো পঞ্চু, আর গায়ের রং যার ফর্সা তিনি কটা পঞ্চু। অর্থাৎ ফর্সা তথা সাদা শব্দের লৌকিক প্রতিশব্দ হল 'কটা'। শুধুমাত্র গায়ের রংয়ের কারণে গ্রামসমাজের বহু শিশুর পরিবার প্রদত্ত পোশাকি নাম হারিয়ে গিয়েছে। তারা আমৃত্যু 'কটা' নামে কাটিয়ে দিয়েছেন। গ্রাম বা শহরের সম্পন্ন পরিবারের অতীব ফর্সা অর্থাৎ ইউরোপীয়দের মতো সাদা চামড়ার সন্তানদের অবশ্য 'সাহেব' নামে ডাকতে ডাকতে ভালো নামটাও অনেক সময় 'সাহেব'ই হয়ে যায়! তা গরিব ঘরে জন্মালে 'সাহেব' হওয়ার বদলে 'কটা' হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

এভাবেই তিনিও আমৃত্যু 'কটা' নামেই পরিচিত ছিলেন। রেজাউল, নাকি আজিজুল কী একটা এই ধরনের ভালোনাম তাঁরও ছিল। কিন্তু সেটা চিরতরে চাপা পড়ে যায় 'কটা'র তলায়! বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। খরিফ ও রবিশস্যের মধ্যবর্তী সময়ে, যখন মাঠেঘাটে কাজকাম থাকত না, এরকম সময়ে তিনি আসতেন। আর এলেই কমবেশি মাস দুয়েক থেকে যেতেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর একটি বিশেষ পেশাগত দক্ষতা ছিল। বাঁশের চাঁছ তুলে 'খলপা' বানাতে পারতেন। সে সময় আমাদের গ্রামে হাতেগোনা কয়েকটি পাকাবাড়ি ছিল। বাকি সবই মাটির বাড়ি। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলিতে মাটির ঘরে কাঠের দরজা-জানালা থাকত। যদিও জানালাগুলো হত খুবই ছোটছোট। গরিব-ঘরে সাধারণত জানালাই থাকত না। তাদের কি আলো-বাতাসের প্রয়োজন থাকতো না? নিশ্চয়ই থাকত। কিন্তু জানালাকে পাল্লা বা 'কপাট' দিয়ে আচ্ছাদিত করার পয়সা থাকত না। সেই কারণে তারা জানালাই রাখতেন না। আর দরজা না থাকলে তো ঘরে ঢোকাই যাবে না, তাই দরজা একটা থাকত। তবে সাধারণত তা থাকত অনাবৃত, অবারিত। কুকুর বেড়াল ছাগল হাঁস মুরগি ইচ্ছেমতো ঢুকে যেত। আর শীত-গ্রীষ্মে অনাহূত ঠান্ডা ও গরম হাওয়া ঢুকে গিয়ে বিপত্তি বাধাত। এই বিপত্তির হাত থেকে বাঁচতেই খালপার ঝাঁপ তৈরি করে নিত কটুকাকার কাছ থেকে। খলপার চারদিকে এবং কোনাকুনি ডবল ডবল বাঁশের বাতাকে তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেই ল্যাকপেকে খলপাগুলো দাঁড়িয়ে থাকার মত মেরুদণ্ড পেত। সেটাই হলো গরিবদের ঘরের 'কপাট'। আবার সচ্ছল পরিবারগুলির ঢেঁকির ঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর ঘেরার জন্যেও ব্যবহার করা হতো কটুকাকার খলপা। তাঁকে 'কটা' বলতে কেমন যেন বাধবাধ লাগত। তাই 'কটা' শব্দটাকে ভদ্রস্থ করে নিয়ে 'কটুকাকা' বলতাম। গ্রামের দিকে তখনো কাকাকে 'কাকু' বলার চল ছিল না। কী আশ্চর্য, কটুকাকা বাবার সাথে তুইতুকারি করে কথা বলতেন, অথচ আমাদের দুই নাবালক ভাইকে আপনি আপনি করতেন ! আমাদের দু'ভাইয়ের পরের বোনটি তখন নেহাতই শিশু এবং তার পরের ভাইটি কার্যত কোলের শিশু। তার পরের এক ভাই ও এক বোন তখনো জন্মায়নি। তা কটুকাকা যে-বাড়িতে যেদিন কাজ করতেন সেদিন সকালে ও দুপুরে সেই বাড়িতে খেতেন। আর প্রায়শই রাত্রে খেতেন আমাদের বাড়িতে। গ্রামের দিকে তখন সন্ধ্যেলাগার সাথে সাথেই 'রাত' হয়ে যেত!

এই কটুকাকা ছিলেন আমার বাবার ছোটবেলার বন্ধু। বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদার বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা -২ নম্বর ব্লকের মথুরাপুর গ্রামে। আর কটুকাকার বাড়ি ছিল পার্শ্ববর্তী কোনো একটি গ্রামে। গ্রামের নামটি মনে নেই! হতে পারে হোসেননগর, হতে পারে বাড়িয়ানগর অথবা দক্ষিণশহর। বাবা ছিলেন ধনীর সন্তান। কটুকাকা জন্মেছিলেন হতদরিদ্র মুসলিম পরিবারে। তবু তাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। শৈশব জাত-ধর্ম, ধনী-গরীব বোঝে না। বাবা ৪৫ টাকা মাসমাইনের স্কুলমাস্টারি ছেড়ে স্বনামখ্যাত নীলমণি ঘটকের স্নেহছায়ায় বসে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে জীবনসাথী করে নিয়েছিলেন। জীবনচক্রের বিড়ম্বনায়, বলা ভালো, কৈকেয়ী সদৃশ বিমাতার সুকৌশলী পরিকল্পনায় ঘরজামাই থাকার শর্তে তাঁর বিয়ে হয় হরিহরপাড়া থানার বহড়ান গ্রামে, আমার মায়ের সাথে। দুই গ্রামের দূরত্ব যে খুব বেশি তা বলা যাবে না এখনকার দিনে। তবে ছোটবেলায় গরু বা মোষের গাড়িতে চেপে মথুরাপুর যেতে প্রায় সারাদিন লেগে যেত। ছোটবেলায় বেশ কয়েকবার গিয়েছি। তা সেখান থেকে কটুকাকা পায়ে হেঁটে আসতেন। তেঁতুলিয়া, ধরমপুর, ডাঙ্গাপাড়া, হাসানপুর, দৌলতাবাদ, বেঁউচিতলা, শহরবাসা ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতেন। যাওয়ার দিন আমার দিদিমা সকাল সকাল ভাত রান্না করে খেতে দিতেন কটুকাকাকে। বলতেন, 'আরেকটু ভাত নাও, বাবা। ঘরে ফিরতে ফিরতে সেই রাত হয়ে যাবে!' দিদিমার নির্দেশ মোতাবেক মা চাল, ডাল, মুড়ি, এটাসেটা ছোটছোট কাপড়ে পুঁটলি বেঁধে চটের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। বস্তা মাথায় করে কটুকাকা যখন বাড়ি থেকে বেরোতেন তখন গোটা বাড়ি থমথমে– অন্য নিকট আত্মীয়রা কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় যেমনটা হতো, ঠিক তেমনই। কী আশ্চর্য, এহেন কটুকাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম! তাঁর কথা, সেই সুদূর অতীতে ফেলে আসা সময়ের কথা, এতদিন পরে ফের মনে পড়ছে। মনে পড়িয়ে দিচ্ছে পরিকল্পিত ঘৃণা-বিদ্বেষের অভাবনীয় আবহ।

বন্ধুতার পাতা

সংকলন : সুখেন্দু দাশগুপ্ত

দাও আল্লা
পানি দাও

আমরা রোহিনীপুর গ্রামের কম বয়সী ছেলেরা ঘেটু গান গাইতাম। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষা, আমরা দঙ্গলে বেঁধে সন্ধ্যে বেলায় জড়ো হতাম এবং ঘেটু গান করতাম। এক অদ্ভুত আনন্দ পেতাম। 'দাও আল্লা পানি দাও' বলে সকলে চীৎকার করে ঈশ্বরকে বাধ্য করা হতো বৃষ্টি ঝরাতে। তবে সব সময় যে বৃষ্টি হবে তা বলা যাবে না।

রোহিনীপুর মুসলমান প্রধান গ্রাম, গোয়াল পাড়া হিন্দু প্রধান। প্রতিদিন প্রায় বাড়ি ঘুরতাম আর গান করতাম। মোটামুটি ৭ থেকে ১০ দিন পর পর ঘুরতাম। শেষ দিনে চাল, আলু, গুড় এমন কী টাকাও আদায় করতাম। শেষ দিন গ্রামের মুসলমান হিন্দু সকলে মিলে এক হয়ে ক্ষীর রান্না করতাম। তারপর ক্ষীর বিতরণ, বসে খাওয়া, বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসা। গড়ে উঠেছিল গ্রামীন সম্প্রীতি। কোনোদিন কেউ বলেনি হিন্দুর রান্না, মুসলমানের রান্না খাবো না।

'আমাদের কথা'/'আমার কথা' পত্রিকার নির্বাচিত সংকলন॥

২

জার্মানিতে নেতাজির তৈরি করা বাহিনী, পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, আই.এন.এ.- তে আবিদ হোসেনের ভূমিকা অজানাই থেকে গেছে।

জয়নুল আবেদিন হাসান, যিনি আবিদ হাসান নামে পরিচিত, পরে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন 'সাফরানি' শব্দটি, যার উদ্ভব হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গেরুয়া বা সাফরন রং। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। মায়ের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ও কার্যকলাপের প্রভাব পড়েছিল তার সন্তানদের ওপর। আবিদ দুই ভাই বদরুল ও জাফরের সাথে যোগ দিয়েছিলেন গান্ধীর সাবরমতী আশ্রমে। গান্ধীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছিলেন বদরুল। ১৯৩৬ এ জার্মানিতে আবিদ হাসানের সাথে সুভাষ চন্দ্র বসুর পরিচয়। সুভাষ চন্দ্রের ডাকে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।

১৯৪১ সালে জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র জার্মানির হাতে বন্দী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে তৈরি করেছিলো 'দ্য ইন্ডিয়ান লিজিয়ন' নামে এক বাহিনী।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি দায়বদ্ধ ও বাহিনীর ঐক্যের প্রতি সমর্পিত ছিলেন হাসান। খাবারের মধ্যে দিয়ে সেনাদের ভিতরে ধর্মীয় বিভাজন বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন আবিদ।

সেনা ব্যারাকে হাসানের ঘরে থাকতেন তিনজন শিখ, দুই জন মুসলমান, একজন হিন্দু।

— অনিরুদ্ধ দাস, দূর করেছিলেন সেনাদের খাবারের ধর্মীয় বিভাজন, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/১/২০২৬.

৬

পশ্চিম বাংলা, দক্ষিণ ২৪
পরগনা, বজবজ।
বজবজ ব্লক ১, বজবজ
বালিকা বিদ্যালয়। ৯০
শতাংশ মুসলমান ছাত্রী।
স্কুলে সরস্বতী পুজোর
আয়োজনে তারাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা,
২৪ জানুয়ারি ২০২৬

[illegible]

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির
রানী মা, অমৃতা রায়ের
শ্বশুর মশাই সৌরীশ চন্দ্র
রায়ের আশীর্বাদ উপলক্ষে
খাওয়ার তালিকায় ছিল
আমিষ খাবার — মটন
কুকেট পোলাও, রোস্ট,
হাঁড়ি কাবাব।
সাল ১৯৪৫।

ঋজু বসু, হেঁটে হেঁটে ফিরছি,
শ্বশুরমশাই কী খাওয়ালেন,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৭/১/১৯২৬

মনুষ্যত্বের কাছে ধর্মের
পরাজয়।
লুইযা মুন্সি

আমার এক বন্ধু নানা
রকমের সমাজ সেবা মূলক
কাজে যুক্ত। বাড়ি
শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর
ছাত্রী।
উনি গরীব ছাত্রছাত্রীদের
কিছু নিজের বাড়িতে, কিছু
অন্যের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা
করে দেন বিনা পয়সায়।
পড়ার জন্য বইপত্তর জোগাড়
করে দেওয়া, দরকারে
টাকা পয়সাও জোগাড় করে
দেওয়া — এমন সব বিভিন্ন
রকমের সাহায্য করেন
ওদের।
নিজে ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও
কোনো জাত ধর্ম বিচার
করেন না।
ওনার বাড়িতে সরস্বতী পুজো হয়
ওর মেয়ের হাতেখড়ি উপলক্ষে।
ওই পুজোয় পৌরহিত্য করে

৪

বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের
এবং নিম্নবর্গের প্রথম, যিনি
বাঁধা কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত
নয়।
তারপর উনি তার মুসলমান
ছাত্রদের ও মুসলমানি
বন্ধুদের দিয়ে কোরান
শরীফ থেকে সুরা ফাতেহা
ও দরুদ শরিফ পাঠ
করান মেয়ের মঙ্গল কামনায়,
সরস্বতী পুজোর সময়
মুসলমান বন্ধুরা খিচুড়ি
ভোগ রান্না করে ওর
বাড়িতে খাওয়া দাওয়া
করেন

আমাদের কথা / আমার
কথা / পত্রিকার নির্বাচিত
সংকলন।

সাগর সঙ্গমে মিলেমিশে
আমিষ নিরামিষ।
বাংলার এই তীর্থে
আমিষ নিরামিষের দ্বন্দ্ব
নেই।
সার দিয়ে খাবার দোকান।
মিষ্টির পাশাপাশি আমিষ
ও নিরামিষ চাউমিন,
মোগলাই, বিরিয়ানি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪/১/২৫

উনিশ শতকে কলকাতাকে
গানে মাতিয়ে রাখতেন
গওহর জান, মালকাজান,
আখতারি বাঈ,
অন্দি সেন, রাগরাগিনীর
গল্প কথা

সুন্দরবনে একই থানে
একই সাথে পুজো হয় —
মা-বনবিবি, মা-জঙ্গলি,
গাজী সাহেব, মা-গঙ্গা,
মা-নারায়নী, মা শীতলা